চলো বেড়িয়ে আসি

দ্বিতীয় খণ্ড

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মনোমোহন প্রকাশনী ● কোলকাতা বারো

দীপা ও সমীরকে—

চলো বেড়িয়ে আসি ১ম খণ্ড

এতে আছে—সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষা।

বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটের ছবি সহ দাম বারো টাকা।

প্রকাশিত হচ্ছে—চলো বেড়িয়ে আসি ৩য় খণ্ড

এতে থাকবে—গোয়া—দমন—দিউ, সমগ্র মহারাষ্ট্র, জম্মু-কাশ্মীরও

তাঁর সন্নিহিত অঞ্চল, সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও তাঁর মন্দিরাঞ্চল।

দাম বারো টাকা মাত্র

সূচীপত্র

নির্দেশিকা সূচী

পাহাড় নদী জল জঙ্গলের দেশে

পৌঁছুনোর রাতটা ঠিক আমাদের দখলে ছিলো না। বৃষ্টি আমাদের সঙ্গে থেকে গোটা রাতটাই উপহার দিয়ে দিল। পিছনে বৃষ্টি, সামনে বৃষ্টি। ডাইনে বৃষ্টি, বাঁয়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি পড়ে হৃদয়ে আমার। আমার হৃদয় আজ ঘাস। ঘাস, না আকাশছোঁয়া পাইন বন -বাংলার ঠিক পিছনদিগন্ত জুড়ে। পরের দিনটাও সন্ধে পর্যন্ত আমাদের। সকালবেলা ট্যাক্সি ঠিক করে শিলং চক্কর মারতে বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া। তিন ঘণ্টা কড়ারে ঝকঝকে ট্যাক্সি। বিশ টাকায় ঘণ্টা। আমরা সকলে মোটা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ট্যাক্সি শহরের গলিগুলি পার হয়ে শিলং-শীর্ষের দিকে।

খাসিয়া উপকথায় বলে এই শিখরে দেবতারা বসবাস করেন। শহর থেকে দশ কিলোমিটারের পাহাড়ি পথ বেয়ে শিখরে উঠতে চমৎকার লাগছিলো। একটা বেদি। চারিদিকে ঝাউজঙ্গল। এক পাশে মিলিটারি ছাউনি। হেলিপ্যাড। সেনানিবাস ছাড়া কিছু কিছু স্থানীয় মানুষের বসতি আছে—ছাড়া ছাড়া ভাবে। এখানেও ভ্রমণকারীরা অনায়াসে যেতে পারেন। গিয়ে থাকতে পারেন। তুটো-একটা দিন। উঠতে মাঝপথে পড়ে পাইনউড হোটেল। চার্জ খুব বেশী। সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। মেঘালয় সরকার যদি পারেন, এই শিখরে শস্তা বাড়ী তৈরী করে দিন। শিখরলোভী পর্যটকদের সংখ্যা নেহাত কম হবে না। বেদির উপর

দাঁড়িয়ে বাংলোর বারান্দা থেকে নিচে পুরো শিলং শহরটা খোলা-মেলা পড়ে রয়েছে। রোদ্দুর ঝকঝকে দিনের চোখের উপর তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়। কী মহান সৌন্দর্য তার। আমরা দেখলাম তুষারে রোদ পড়ে তাকে আরো জ্যোতির্ময় করে তুলেছে।

শিখর থেকে নামতে নামতে আমরা এসে পৌঁছুলাম হাতিশুঁড় জলপ্রপাতের ধারে। ইংরিজি নাম এলিফ্যানটা। ওপর থেকে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে একদম নীচে চলে যাওয়া যায়। ঠাণ্ডা থেকে আরো ঠাণ্ডায়। আরো স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার পাহাড়ের গর্তে, গভীরে। পথের দু' পাশ থেকে ঝর্ণার জল সশব্দে ঝরছে। আমি অর্দ্ধেক পথ নেমে থমকে দাঁড়ালাম একটা পলকা ব্রিজের ওপর। আর নয়। সঙ্গে বাচ্চারা আছে। তাছাড়া পথও বেশ পিচ্ছিল। আর নামা ঠিক হবে না। সঙ্গীদের অনেকেই একেবারে নিচ পর্যন্ত চলে গেল। আমরা উপরে উঠে রডোডেনড্রনেরন ছায়ায় বসলাম। সেখানেও বসার জন্যে বেদি। বেদির একপাশে খাসিয়া যুবতী। চা বিক্রী করছে। মাথার ওপর রডোডেনড্রনের কালচে-সবুজ পাতার ফাঁকে এখনো রাঙা ফুলের অবশেষ। সেই রং লেগেছে ঐ মেয়েটির গালে। পিছনে দোকানের আসল কর্ত্রী, সামনে সহাস্যবদনা মেয়ে, হাতে হাতে চা দিচ্ছে, ডিমসিদ্ধ আর তাম্বুল পান। ওঠা-নামার ক্লান্তিটুকু, এই ক্ষণিক বিশ্রামে, চা-পানে উবে গেলো।

হাতিশুঁড় ছাড়াও অন্যান্য বিখ্যাত ঝর্ণাপ্রপাতগুলোর মধ্যে সেই আমাদের 'শেষের কবিতা'র চেনা বিশপ বীডন। তাছাড়া আছে, ক্রিনোলাইন, স্প্রেডঈগল, সুইট—এই সব। চারচ মোনা-স্টেরি গুরুদ্বার মন্দির মসজিদে ভর্তি এই শহর।

হাতিশুঁড় থেকে সোজা নেমে এলাম গলফ কোরসে। সবুজ উঁচু-নিচু ময়দান। জায়গায় জায়গায় মোটা কালচে ভুরুর মতন পাইনঝোপ। গা কেটে আঠা নেবার জন্যে টিনের কৌটা পাতা গাছে গাছে। আমি একবার গাছে গাছে কবিতা টাঙানোর কথা

লিখেছিলাম। পোষ্টারিংয়ের মতো করে। কিংবা তার চেয়েও একটু বেশী—দীর্ঘস্থায়ী, ক্ষয়হীন করে। এখানে এসে তা অনায়াস-সম্ভব বলে মনে হলো। বৃষ্টি জল তিরতির করে ঘাসজমি বেয়ে নিচে নামছে। কোথায় ভিজে, কোথায় শুকনো, পা না দিয়ে বোঝার উপায় নেই। উধাও মাঠ। ঝরঝরে সবুজ। বৃষ্টি থমকানো আকাশ রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে। দু-তিন দিন উবুশ্রান্ত বৃষ্টির পর কী মিষ্টি লাগছে এই রোদ।

গলফ ক্লাব ছেড়ে আরো নিচে নামতেই হলো। চোখে আটকে রইলো, গলফ গ্রীণের সবুজ জলে সাঁতার কেটে চলেছে এক যুবক, এক যুবতী। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ সাঁতার। মাছরাঙার রঙে রঙ। দৃশ্য হিসেবে চমৎকার। মন কেমন করে ওঠে। অকারণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে নিজেরই অজান্তে। ওয়ার্ড লেকে পৌঁছুলাম। আমাদের বাংলো এখান থেকে কাছে। একটু উঠতে হবে। লেকে শিকারা বাঁধা। কেউ কেউ তা চড়ে গোটা লেক পরিক্রমায় বেরিয়েছে। জলে গিজ গিজ করছে লাল-হলুদ মাছের দল। সিলভার কার্প। ব্রিজের উপর থেকে ছোলা ফেলে দিলে ছুটে এসে কপ্ করে গিলে নিচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। অকুতোভয় মাছগুলি। পাড়ের কাছে—মাঝপুকুরে খেলে বেড়াচ্ছে।

শিলংএ থাকার জায়গার অভাব নেই। সরকারি বেসরকারি হোটেলের নেই সীমাসংখ্যা। ছোট-বড়ো-মাঝারি—যার যেমন ক্ষমতা, তেমন হোটেলে গিয়ে ওঠো। থাকো না দু'দিন—দশ দিন।

শিলংয়ের এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতে আসা। সুতরাং সব কিছুই শিলংমুখী। বিকেলের দিকে কোটা নগরের জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যর বাড়িতে জনাকয়েক অধ্যাপক এলেন। সঙ্গে শিলং থেকে কবি বীরেন রক্ষিত। বীরেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছেন এখন। দীর্ঘদিন শিলং-এ। বললেন, দু'দিন বাদে শিলং যাচ্ছি। তখন দেখা হবে।

আমরা চোদ্দ তারিখে যাচ্ছি। তিনদিনের সভা। অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল, শীর্ষেন্দু ওদের জন্য অপেক্ষা এখন। ওরা কাল উড়ে আসবে। উড়ে এসে জুড়ে বসবে। ওরা এলেই পাহাড়ে, শীতে, ঝর্ণা-জলপ্রপাতে।

ক'দিন ধরে ভীষণ বৃষ্টি। আকাশের গোমড়া মুখ। কালো পীচপথের ওপর গুলমোহর ঝরে আছে। বারান্দায় বসে পাহাড়ের দিকে। কালোমেঘ, কচু আর পদ্মমানের পাতায় বৃষ্টি পড়ছে। শামুক আর শুঁয়োপোকা উঠে আসছে ঢালু বারান্দায়। গরু-বাছুর গা কুঁকড়ে ঘাসে মুখ।

বিকেল নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরলে অধ্যাপক-বূ্যহ কেটে বাইরে। গৌহাটি যাবো। সঙ্গে অনেকগুলো কলকাতা থেকে বয়ে আনা খৎ। নানাজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মতলব আছে। কাজ-কর্ম, সুবিধা-অসুবিধার জন্যে বহুলোককে খুঁজে বের করতে হবে। সময় কম। উজানবাজারে শচীন বরুয়ার বাড়িতেই প্রথম। হিন্দুস্থান টাইমসের সাংবাদিক। আসামের খবর পাঠায় নিয়মিত। রবীন্দ্রনাথের গান গায়। জীবনানন্দের পদ্য মুখস্থ শোনায়। চমৎকার বাংলা বলে। দারুণ মানুষ।

থই থই ব্রহ্মপুত্রের পাশ দিয়ে বাস গিয়ে দাঁড়ালো উজান-বাজার। সময় কম। শচীন সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লো। সন্ধ্যাহ্নিক করা দরকার।

ওকে বললাম, দু'দিন বাদেই পাহাড় থেকে নামবো। তখন কাজ রেখো না। আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। যেদিকে দু' চোখ যায়, যাবো। ব্যবস্থা রেখো, যাতে মানস আর কাজিরাঙ্গা যেতে পারি। ইচ্ছে আছে নাগাল্যাণ্ড হয়ে ফেরার। সেইমতো ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

সাপের মুখ-ছেঁড়া বৃষ্টি তখনো হয়ে চলেছে। কামাই নেই। দুপুরে খিচুড়ি-ভোগ সেরে শিলং-এর দিকে। আঁকাবাঁকা সরু পথ

পাক দিয়ে ক্রমাগত উপরে উঠছে। পথে দিসপুর। আসামের নতুন রাজধানী। এখন আর গৌহাটির তেমন কদর নেই। সরকারি দপ্তর মন্ত্রিনিবাস-অফিস-কাছারির একটা মোটা অংশ আজ দিসপুরে। বাঁদিকে কংগ্রেস অধিবেশন সংক্রান্ত ঘরবাড়ি আবাসমহল। ডানদিকে টিলার চূড়ে ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে তৈরি বিশেষ বাংলো। বছরে দু'একদিন অন্তত থাকতে পারেন, এ জন্যে বানানো।

দু'দিকেই পাহাড়। পাহাড় জুড়ে চাষবাস। কলা, আনারস। সিঁড়ি-ভাঙ্গা অঙ্কের মতো ক্ষেত। ভুট্টা জোয়ারের ঢলঢল গাছপালা। বাঁশ পাহাড়মানুর ক্ষেতে ধান। বৃষ্টি ধুয়ে-মুছে সবুজকে এমনভাবে সাজিয়েছে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। গায়ে বসে যাচ্ছে সবুজ-শ্যাওলার রং বর্ণ। আমাদের গাড়ি সাবধানে একবার উঠছে, একবার নামছে। এভাবে পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে আমরা ছুটে চলেছি শিলংয়ের দিকে। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে।

খাসী, জয়ন্তিয়া আর গারো পাহাড়—তিন মিলিয়ে নতুন রাজ্য মেঘালয়। তার রাজধানী শিলং। সমুদ্র পিঠ থেকে হাজার মিটার উঁচুতে। ভারতে আর কোন পাহাড়ি শহর এতো সুন্দর নয়। পূর্ব দেশের স্কটল্যাণ্ড বলতো সায়েবসুবোরা। গৌহাটি থেকে একশো চার কিলোমিটার। কলকাতা থেকে খোদ শিলং-এ উড়ে পেঁছানো যেতো। সপ্তাহে তিনবার। কলকাতা-গৌহাটি উড়োজাহাজ তো আছেই। গৌহাটি থেকে সুন্দর বাসে শিলং ভাড়া ন' টাকা। ট্যাক্সি আছে। পুরো নিলে পঞ্চাশ। মাথাপিছু গোটা দশ। তবে, বাসই ভালো, ঐ গাদাগাদি ট্যাক্সির চেয়ে। অন্তত আমার তো খুব ভালো লেগেছিল।

রংপোর একটু আগেই আসাম শেষ, মেঘালয় সুরু। আমরা জলহাওয়া খেতে একটু থামলাম। কোমর ছাড়াতেও বটে। এক চালা উঁচু দোকান বাঁহাতি। কিছু প্লাম, পেঁপে, মুখ শুকনো

আনারস আর কলা। চড়ায় ছড়ায় টুকটুকে লঙ্কা। জংলা ঢেঁকিশাক কচুর লতি আর স্কোয়াস পাহাড়ি আলু। এসবের পিছনে অন্যমনস্ক বুড়ি খাসিয়া দোকানি। ডানদিকে পাকা দোকান সারবন্দী। বাজার এলাকা। এতো মাইল দৌড়ে এসে একটা মাঝারি হাটতলা এই প্রথম। এর পর পথ উঠবে। রাস্তা সরু হবে। বাঁক বাড়বে। দৃশ্য আরো সুন্দর। আরো চিত্তহরা হয়ে উঠবে।

বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর সত্যিকারের হাসুলি বাঁক পার হলেই নীল জলের পাথার। পাহাড়ে-ঘেরা এই হ্রদের নাম নাকি উমিয়ম! বাঁপাশে টিলার মাথায় বিখ্যাত পাইনউড হোটেল একটা লেক-ভিউলজ তৈরি করেছে। জানি না, মাথা-কাটা দরই হবে! মেঘালয় সরকারের উচিত শস্তা-গণ্ডার ছোট বাড়ি অনেকগুলি তৈরি করে দেওয়া। কয়েকটি তাঁবুর ব্যবস্থা। কিছু হাঁড়ি-কুড়ি বকনো স্টোভ—ব্যবস্থা রাখা। ছ'দিনের জন্যে যাতে পর্যটক এখানে থাকে। থাকার যোগ্য জায়গাই বটে। মাছ ধরার সখ থাকলে তো কথা নেই। নামতে থামতে হবেই। মাছ মারিয়ের দল শত শত বসে গেছে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে সেই নীল জলের পাথার। পাইন বনের ভিতর দিয়ে তার রূপ টুকরো টুকরো হয়ে স্মৃতিতে বসছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে-প্রাসাদের দিকে ছুটে চলেছি, তার সিং-দরজার সৌন্দর্যই যদি এতো, তাহলে সে, না-জানি কেমন সুন্দর হবে?

এখন ছ'দিকেই পাইন বন। পাহাড় উঁচু হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাড়ছে। গায়ে সোয়েটার চড়াতেই হলো। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। যে রকম বৃষ্টি, তাতে মনে হচ্ছে আজকে সাহিত্য-ফাহিত্য পণ্ড। অমিতদার উদ্বোধন। আজ আমাদের স্পষ্ট কোনো কাজ নেই। মঞ্চে বসে থাকতে হবে প্রমাণ স্বরূপ। আমরা যে এসেছি তার প্রমাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সভা বসবে। আমরা গিয়ে উঠলাম

আর্ল হলিডে হোমে। পরিষদের কাছেই। আগে নাকি, এটা একটা সানাটোরিয়াম ছিলো। এখন সরকারি পরিচালনে।

পিছনে গভীর পাইন। সামনে ফুল বাগান। খোলামেলা কাঠের এই হোটেল নেহাত মন্দ না। উবুশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে বলেই যা একটু অসুবিধে। বাচ্ছারা ভিজে গেছে দেখে একটু ভয় হলো। ব্যবস্থা একটু অসতর্ক। ঘরে ঢুকতেই দেখি মেজে আর টেবিলে দুটো প্লাসটিক জাগ পাতা। কেন? একটুক্ষণ বাদেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। ওরা জল ধরছে। জলের ফোঁটা টপটপিয়ে জল ঝরছে ঘরের মাথা থেকে। মন্দ লাগলো না। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। অন্তরে টপটপ। সময় মতো ফেলতে হবে। একটু নজর রাখতে হবে। নইলে মেজে জলে জলময়। সাহিত্য সেবার সঙ্গে এটুকু সেবা করা যায় অনায়াসে। আমরা পাশাপাশি দুটো ঘরে শিলং বাস সুরু করলাম। থাকবো তিন দিন। বড়ো জোর চার। আশা করছি, বৃষ্টি থামবে। আজ না হয় তো কাল।

(হোটেল ও অন্যান্য বিবরণের জন্য নির্দেশিকা দেখুন।)

বাসত্তরীয়া

ব্রাহ্মণের নাম কেন্দুকলাই। সিদ্ধ পূজক ব্রাহ্মণ তিনি। তাঁর নামে যে প্রবাদ তা হলো, সন্ধ্যারতির সময় প্রতিদিন দেবী তাঁকে দর্শন দিতেন। একথা লোকমুখে তাঁর কানে পৌঁছালো। কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ছুটলেন সেই সিদ্ধ পূজকের কাছে। যে কোনো উপায়ে আরাধ্যা দেবীদর্শন চাই। বিনিময়ে ব্রাহ্মণের অভাব মেটাবার দায়িত্ব রাজার।

ব্রাহ্মণ আরতি শুরু করেছেন। মৃদু ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে নৃত্যরতা দেবী অন্যান্য দিনের মতো। দেবী সর্বজ্ঞা। টের পেলেন ভোগগৃহের উত্তর গবাক্ষে মহারাজা এসে দাঁড়িয়ে আছেন। 'পাথর হও' ব্রাহ্মণকে এই অভিশাপ দিয়ে মিলিয়ে গেলেন তিনি। যাবার আগে রাজাকে বললেন, 'এক্ষুনি নীলাচল ছেড়ে চলে যাও। তুমি বা তোমার বংশধর কেউ আমার পীঠস্থানে আসবে তো না-ই, এ-পাহাড়ে পর্যন্ত ওঠা বারণ তোমাদের। না শুনলে নির্বংশ হবে।'

প্রবাদের সত্যাসত্য জানি না। তবে যাকেই শুধোনো যাক সে এ-ধরনের একটি গল্প শোনাবে। কুচবিহার রাজবংশের কেউ এ-পথ দিয়ে গেলে পাহাড়ের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখবে। গাড়ির ডানদিকের কাচ ঢাকা দেখলেই বোঝা যাবে কুচবিহার রাজবাড়ির কেউ পথ দিয়ে এইমাত্র চলে গেলো।

নীল চোখ, গায়ের রং কাঁচা হলুদ। স্নাতক ছেলেটির নাম রতীশ শর্মা। ক্রিকেট খেলোয়াড় পার্থসারথির কেউ নাকি? আসলে

কামাখ্যা মন্দিরের পাণ্ডা। গায়ে এণ্ডির চাদর। পরনে সিলকের ধুতি। কপালে সিঁদুরের তিলক কাটা। বয়েস ? পঁচিশ-ছাব্বিশ বড়োজোর। বছর দুই হলো পাশ করেছে। ইচ্ছে তো ছিলো, অন্য কিছু করার। বাবা মারা যাবার পর সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। তার ওপর কাকার সংসার। কাকার ছ মেয়ে। একজনের বিয়ে হয়েছে। বাকি পাঁচজনই ইস্কুলে। বড়ো দুজন আসচে বছর ফাইনাল দেবে। নিজের দুটি বোন। বড় বোন গিরিজা ক্লাস নাইনে পড়ে। ছোটটি সিকসে।

কামাখ্যা মন্দিরে হেঁটে ওঠার পথই এতোদিন সম্বল ছিলো। এই ক বছর রাস্তা পাকা হয়েছে। পিচ রাস্তা ধরে নিয়মিত বাস যায়। ট্যাক্সি যায় সটান ভুবনেশ্বরী মন্দির পর্যন্ত। ভুবনেশ্বরী ৬৯০ ফুট উঁচু। কামাখ্যাপীঠ ৫২৫। বরাহপর্বত ৪৫০।

আমরা মালিগাঁও থেকে কামাখ্যা পাহাড়ের নিচে পৌছুই বাসে। সেখান থেকে ট্যাক্সি। ঠিক হলো ভুবনেশ্বরী পর্যন্ত যাবো, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকবে। বেশিক্ষণ লাগবে না। পুজোআচ্চার ব্যাপার নেই। শুধু চোখ মেলে দেখা। সবাই দেখতে আসে। পাহাড়ের গা বেয়ে ব্রহ্মপুত্রের নীল জল। তার ডান প্রান্তে গৌহাটি শহরের হিজিবিজিবিজি দৃশ্য। নদ-মধ্যে ভৈরব উমানন্দ দ্বীপবাসী। উমানন্দ কামাখ্যা-দেবীর ভৈরব। উমানন্দ বা ভস্মকূট পাহাড়ের দক্ষিণে নদ-মধ্যে উর্বশীকুণ্ড। অশ্বক্রান্ত বা অশ্বকান্ত ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে উত্তর গৌহাটিতে। স্টীমার বা নৌকো করে যেতে হবে উমানন্দও তাই। উমানন্দে নৌকায়। ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গে টিলার উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে। কাঠচাঁপার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে বনতুলসীর বুনো বাস। বাতাসে ভেসে আসে কামাখ্যা মন্দির থেকে ঘণ্টাধ্বনি। জীবনে অনেক মন্দিরে গেছি ডাকসাইটে মন্দিরগুলোয় গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে করুণ। বিশেষ করে পাণ্ডাদের পীড়ন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। পুরী

থেকে শুরু করে কাশী—সর্বত্রই তাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। যা দেখিনি পশুপতিনাথে। এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আবার দেখলাম কামাখ্যায়।

১১৫০ সালের কথা। পালবংশের রাজা ধর্মপাল এখনকার গৌহাটির পশ্চিমখণ্ডে রাজত্ব করতেন। তিনি কান্যকুব্জ থেকে এঁদের আনেন। কামরূপের শুয়ালকুচি গ্রামে এই ব্রাহ্মণদের বেশ একটি বড়ো অংশ বাস করতো। এঁদের নাম 'বাসন্তরীয়া ব্রাহ্মণ'। এঁরাই কামাখ্যাদেবীর আদি পূজারী। কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ। আমাদের রতীশ শর্মার পূর্বপুরুষ। কামাখ্যায় 'বাসন্তরীয়া কলোনি'র একজন।

রতীশ ভালো বাংলা বলতে কইতে পারে। পড়াশুনোর মাধ্যম অসমীয়া। বাংলা আর অসমীয়া—'বাসমীয়া' মিশ্র ভাষায় কথা বলে ছেলেমেয়ের দল।

মন্দিরের চতুর্দিকেই বাড়িঘর, পাণ্ডাপল্লী। পাণ্ডা ছাড়া, সেবাইত আছে, ধোলাই-ঝাড়াই করে তারা আছে। এখন সব মিলিয়ে কলোনির লোকসংখ্যা প্রায় হাজার আটেক।

হাইস্কুল আছে—ছেলেমেয়ে উভয়ে পড়ে। প্রাইমারি স্কুল আছে। চতুষ্পাঠি, লাইব্রেরী, ক্লাব, নাট্যসমিতি সমস্তই আছে। মায় পোস্টাপিস, ছোটখাটো হাসপাতাল।

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে যারা যায় তারা ছোটে গৌহাটি শহরের কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে। দুজন পাশকরা ডাক্তার—এখন বসছেন গৌহাটিতে চেমবারে। কলেজ থেকে বেরিয়ে মেয়েদের কাজকর্মের একটু অসুবিধা। স্কুলে পড়ানো ছাড়া কেউ কেউ কেরানির চাকরিতে ঢুকেছে। পাশকরা নারস হিসেবেও কাজ করছে কেউ কেউ। পলিটেকনিকে পড়াশুনো করায় আগ্রহ প্রচুর। পাশ করলে চাকরি পাওয়া যায়। দুজন পাণ্ডা কলোনির ছেলে বিলেতে ডাক্তারি করছেন। মোট কথা, এক সুষম রুচির পরিচয় এ-কলোনির সর্বত্র। পোশাক-আসাক থেকে শুরু করে, আচার-ব্যবহার সাধারণ

ভদ্দরলোকদের হার মানায়। ছেলে-মেয়ে সবাই সুন্দর দেখতে। সবারই বেশ সচ্ছল অবস্থা। জোতজমি প্রায় সবার আছে। রাজার দান ছাড়াও মন্দির-ব্যপদেশে আয়ও নেহাৎ কম না।

আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র পর্যন্ত জমাট শীত। আম কাঁঠাল আর নারকেল কুঞ্জ-ঘেরা এই পাহাড়ের নীল-সবুজ বসতি, ধার্মিক না হলেও, যে কোন শান্তিপ্রিয় মানুষকে এখানে টেনে এনে বেশ কিছুদিন রেখে দেবে।

রতীশকে জিগ্যেস করছিলাম অসুখ-বিসুখ কেমন ?

কিছু নেই। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। সত্যিকারের স্বাস্থ্যনিবাস বলা যায়। থাকুন না এখানে এসে একটা মাস।

সত্যিই থাকা যায়। কাঠের কাঠামোর ওপর চুনমাটি দিয়ে দেয়াল-মেজে। বিজলী আছে। তবে সব বাড়িতে নেই। রতীশের নেই। তার টেনে আনতে অনেকের ভয় আছে। আগুন ধরে যাবার ভয়। বর্ষায় বাজ পড়ে খুব। দোতলা মাটির বৈঠকখানা। কাঠের ডিভান, টেবিল, খাট। তকতক ঝকঝক করছে। চা পান খাওয়ালো তো বটেই মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লো না। তারপর কিছুক্ষণ ঘুরে এসে হাত জোড় অনুরোধ—অন্ন ছুটি না নিয়ে যাওয়া চলবে না। ওর ক্ষেতের জোহা চাল। যেমন সুগন্ধ, তেমনি সুস্বাদু।

—আমার সঙ্গীরা পূর্বস্মৃতি থেকে বললেন।

এবারের মতো মাফ চেয়ে নিলাম। বললাম, পরে চিঠি দিয়ে আসবো। তোমার এখানে থাকবো। তীর্থ করতে যারাই আসেন তারা পাণ্ডাদের ওখানে দু-তিন দিন থাকেন। দেবীর পুজাপাঠ সারেন। এছাড়া দুটি ধর্মশালা আছে। কামাখ্যা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে অভয়ানন্দ ধর্মশালা, আরেকটি শ্রীধর্মশালা, স্টেশনের গায়েই—হরিবকস আগরওয়ালার দান।

রতীশকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর জোগাড় করছিলাম : গত বছর

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল—ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ৪৮ জন। তার মধ্যে ৩৮ জনই পাশ করেছে।

বালিকাদের জন্যে নতুন স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০, ছাত্র সংখ্যা ৪০০। প্রাথমিক স্কুলে ২০০০ জন অন্তত পড়ে।

রতীশের ঘর থেকে। নামার সময় তাঁতের খটাখট আওয়াজে চমকে উঠি। হ্যাঁ, ওদের বাড়ির মেয়েদের বেশির ভাগই তাঁত বোনে। ফিরে আসার আগে 'তাম্বুল পান' এগিয়ে দিল গিরিজা, রতীশের ছোট্ট ফুটফুটে বোন। কাঁচা শুপুরি আর একগাদা পান, পাশে এক বড়ি চুন। খয়ের নেই। আসামের সর্বত্র এই নিয়ম। কেউ না খেলে অপমান করা। আমার বিলক্ষণ অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি দুখণ্ড তাম্বুল গালে ফেললে গিরিজা বলে, পিক ফেলে দেবেন। কথা দিয়েছেন, আবার আসবেন কিন্তু। মনে থাকবে তো?

—মন কি আমাদের অতো ভালো গিরিজা? তবু চেষ্টা করবো। তীর্থে তো আর বার-বার আসা হয় না, হতে চায় না।
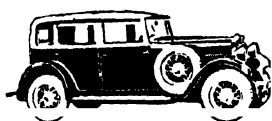
চা বাগানের মধ্যে, তেলের শহরে

পথ আমায় টেনেই আছে। এবার একেবারে টানতে-টানতে নিয়ে চললো অরুণাচলের সীমান্ত পর্যন্ত। ডুলিয়াজান—তেলের শহর। যেমন ছিমছাম, তেমনি পরিপাটি সাজানো। ফুলের নামে রাস্তার নাম। কোনটি কাঞ্চন, কোনটি গুলমোহর। যার নাম কাঞ্চন সে রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ কাঞ্চন। আর কেউ নেই, কিছু নেই। শহর বেশিদিনের না, ইস্কুল, কলেজ, বাঁধানো পাকা বাজার, কিন্তু সন্ধ্যা বাজার। হাজার আট দশ মানুষের বাস। ক্লাব লাইব্রেরি সব আছে। অফিসার পাড়া আছে। সেখানে আছে লম্বে-চওড়ে ক্লাব, নিজস্ব পানশালা। ডুলিয়াজানে মদের দোকান নেই। মাংস শস্তা। মাছ আগুন। বাগানে লঙ্কাগাছ রাঙা টুকটুকে করে লেবুগাছে থই থই লেবু। পদ্মমানের ঝোপ। চলচলে কুমড়ো গাছ লতিয়ে চলছে তো চলেছেই। ঢেঁড়শ আছে, ঝিঙে আছে। কারি পাতার গাছ আছে। দু ফুট লম্বা সাপের মতন বরবটি মাটি ছুঁয়ে আছে। সামনে ফুলের বাগান। ব্লীডি হার্ট প্রায় সবার বারান্দায়। এই ফুল আর ফুলের নাম শুনে দেখে চমকে গিয়েছিলাম উত্তর-বাংলায় গিয়ে, বছর কয় আগে। সাদা ফুটফুটে ফুলের থোকা, ফুলের অন্তরময় রক্ত। না, রক্তের বাড়াবাড়ি নয়। সীমা সীমান্ত মিলে রক্তের ফোঁটা। এই গাছ লতিয়ে তুলে বারান্দা জুড়ে তোরণের মতো।

মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা সব ঘরের। তেলের শহর, তেলের টাকা। তেল-চপচপে চেহারা সবত্র। কোয়ার্টার ফ্রী, আলো

পাখা ফ্রী, রান্নার গ্যাস ফ্রী, ফ্রী টাউন। রান্নাঘর থেকে হুসহুাস শব্দ শুনে চমকে গিয়েছিলাম প্রথমটায়। ব্যাপারটা কী? কোথাও আগুন লাগালো নাকি? মোটেই না। হু হুটো চুল্লী রান্না ছাড়া ছু-দশ মিনিটে মানুষই পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। এতোই আগুনের চাপ। শুনলুম, অনেক বাড়িতে ন দশ বছর আগে একটা দেশলাই কাঠি খরচ হয়েছিল। তারপর আর নেভানো হয় নি। অন্তত দেশলাই কাঠির খরচটা তো বাঁচলো। এখানে গ্যাসের কোন দাম নেই। কাজেই লাগানো যায় না। ১৩২টা পিট আছে। কয়েকবছর যাবত দিনরাত জ্বলে যাচ্ছে। গ্যাস পুড়িয়ে ফেলতে হচ্ছে। না পোড়ালে গোটা আসাম উড়ে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তেলের ওপর গোটা আসাম ভাসছে। বছর কয় হলো গ্যাস কোমপানি খাড়া করা হয়েছে। সিলিনডারে পুরে গ্যাস বেচা হচ্ছে কাছাকাছি চা বাগানগুলোয় আর বড়োবড়ো শহরে। এখনো ব্যাপক ব্যবস্থা করা যায়নি। চেষ্টা চলছে।

সন্ধে থেকে সারারাতহুলিয়াজানের আকাশ রাঙা হয়ে থাকে। গরমে বেশ গরম। শীতে খুব ঠাণ্ডা তাই পড়তে পায় না। বর্ষায় পথঘাট পাকা বলে অসুবিধে হয় না। সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। তার জন্যে সময় লাগে। অবসর লাগে। এখানকার মানুষের অবসর কম। সন্ধেবেলায় গভীর রাত। কারণ সকাল আটটার মধ্যেই কর্মস্থলে ছুটতে হয়। রাতে আড্ডা তাই অচল এখানে।

ছুলিয়াজানে রেল স্টেশন আছে। তিনসুকিয়া থেকে এখানে আসা যায়। তারপর তেলের কাঁচা শহরে পৌঁছুতে রিকসা। আধঘণ্টা বড়ো জোর। তিনসুকিয়া থেকে বাস আছে, মিনিবাস, ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে মাথাপিছু চারটাকা। আসার পথটা চমৎকার। চমৎকার উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ। ছুপাশে চাবাগান। হঠাৎ ম্যানেজারদের বাংলো। এসটেটের আভাস। সারাপথ ঝলমল

করছে বিজলী বাতির আলোয়। থেকে থেকে মাদলের স্খলিত আওয়াজ। চকিত সাইকেল ঘন্টি। আর কিছু নয়। এখনো মাঝে-মাঝে হাতির পাল বেরিয়ে পড়ে। অকস্মাৎ চিতার খবর শোনা যায়। বছর খানেক আগেও এ অঞ্চলে প্রায়ই হাতির গল্প কানে আসতো।

তিনসুকিয়া থেকে ডুলিয়াজান যাবার মোটর পথটি বাস্তবিক মনে রাখার মতো। একধরণের ঠাণ্ডা সবুজ চোখ চেপেধরে। সেই সবুজে বুঁদ হতে বর্ষার সময়টাই শ্রেষ্ঠ সময়। সেই সময় পাহাড় গাছপালার ঠমকই আলাদা। তিনশুকিয়া আপার আসামের একটা বেশ বড়োশড়ো শহর। চওড়া বাজার-অঞ্চল। নানারকম ব্যবসাপাতি তো আছেই, আসামের বাঙালীদের একটা পুরনো উপনিবেশ। আধা গ্রাম আধা শহর। বহু ব্যবসা এখনো পর্যন্ত বাঙালীদের হাতে। অজস্র দোকান পাট। স্থাবর সম্পত্তি। চা বাগানের অধিকার এবং অংশ। সিনেমা হল। কলেজ ইস্কুলের চাকরি। মাড়োয়ারিদের ব্যবসাও পাশাপাশি জমে উঠছে। পানজাবি গুজরাটি ব্যবসায়ী নেই। কাবলিঅলা আছে। তারা 'বাংসামী' ভাষায় কথা কয়। বাংলা আর অসমীয়া মিশিয়ে একধরনের মিশ্র ভাষায়।

তিনসুকিয়াকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে আছে অজস্র চাবাগান। তাই চাবাগানের ফুসফুসের মতো তিনসুকিয়ায় অহোরাত্র অতন্দ্র প্রহরা।
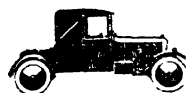
কাজিরাঙা অভয়ারণ্যে

ট্রেনে কলকাতা থেকে সোজা ফুরকাটিং। সেখান থেকে গোলঘাট মহকুমা শহরে। মাত্র ৫ কিমি আর সেখান থেকে সত্তর কিলোমিটার উজিয়ে কাজিরাঙা। কাজিরাঙা অভয়ারণ্যে। গোলাঘাট থেকে নিয়মিত বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস, যেটা ইচ্ছে। কিংবা উড়ে চলুন গৌহাটি। বিমানবন্দরের নাম বড়ঝড়। শহর থেকে ২৭ কিলোমিটার। গৌহাটি পৌঁছুতে বোয়িং ৭০৭ নেবে পৌণে একঘণ্টার মতো সময়। জোড়হাটেও নামতে পারেন। জোড়হাট থেকে ৯৭ কিমি, বাস ট্যাক্সি সব আছে।

আমরা গিয়েছিলাম গৌহাটি থেকে। ভোরের বাস দুপুরে নামালো। পথে নওগাঁ। বড় শহর। বড় বাস গুমটি। ট্যুরিস্ট লজে খবর দেওয়া না থাকলে নওগাঁতেই দুপুরের ভাতমাছ, ভাতমাংস খেয়ে নেওয়া ভালো। টকটকে কাঁচালঙ্কা লেবুর আচার টেবিলের শোভা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টেবিলের কাপড়। বাসনকোসন থালাগেলাস। মাঝারি দর। সকাল থেকেই টিপটিপে বৃষ্টি। আসাম সফরের মোটা মালপত্তরের মাত্র একটা অংশ নিয়ে বাসে চড়েছি। বাসের মাথায় বড়ো স্যুটকেশ, তো হাতেকোলে সিটের খাঁজে হাতবাকসো, কীটব্যাগ। দৌড়ুনো বাসের জানালা গলে শীতের হাওয়া।

গোটা আসামে বৃষ্টি নেমে গেছে। জঙ্গলে যাবার ঠিক সময় এটা না। কিন্তু এসে যখন পড়া গেছে, একচক্কর না ঘুরে যাবার মানে হয় না। তাই ঘুরতে বেরুনো। গৌহাটি থেকে কাজিরাঙা ২১৭ কিলোমিটার। জাতীয় সড়ক ৩৭। ঝকঝকে পিচরাস্তায়

দিয়ে সরকারি বাস হরিণ-গতিতে ছুটে চলেছে। আমরা দুপাশের লোকালয় সেলাই করতে-করতে এগিয়ে চলেছি।

আগের ব্যবস্থা তছনছ। শিলং থেকে সময়মতো নামা হয়নি। বৃষ্টির জন্যে। নয়তো গতকালই পৌঁছে যাবার কথা। সরকারি আনুকূল্যে, জিপে। খাওয়া থাকা ঠিকঠাক ছিলো। আজ নেই। আজ কপাল ঠুকে বের হওয়া। জায়গা একটা হবেই। সঙ্গে হিন্দুস্থান টাইমসের শচীন বরুয়া আর আমার সহকর্মী বন্ধু সুকুমার বাঁড়ুজ্জে। সঙ্গে দুই বাচ্চা, স্ত্রী। অন্তত দুটো ঘরের দাবিদার এই পর্যটক দল। নির্দিষ্ট বাসে, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সামনে—যাওয়া হচ্ছে। কোথায়? না রাইনোল্যানড কাজিরাঙায়।

একশৃঙ্গী গণ্ডারের অভয়ারণ্য খুব বেশি নেই। সেদিক থেকে কাজিরাঙা প্রধান। ৪৩০ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই জাতীয় উদ্যান। চুয়াত্তরের ১লা জানুয়ারি থেকে এই নতুন নামে নাম। সত্যিকারের ঘনগভীর জঙ্গল ২৮ ভাগ, তৃণভূমি ৬৬ ভাগ, আর বিলজলা শতকরা ৬ ভাগ। এই নিয়ে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান আজকের। নানাভাবে কাজেকর্মে যুক্ত আছে ১৮৩ জন কর্মচারী। বনের ভিতরে ক্যাম্প ছত্রিশটা। শুকো সড়ক লম্বে ১৪০ কিলোমিটার—সব মিলিয়ে! এখন মূল রাস্তা ছাড়া সব পথই জলের তলায়। এককোমর জল জায়গায় জায়গায়। গণ্ডার আর কিছু হরিণ ছাড়া আর কিছু পাবার জো নেই। ঘন জঙ্গলে উঁচু জায়গায় গিয়ে বেঁচেছে। বুনো হাতি অনেকেই দেখেছে। আমরা দেখতে পাইনি। ১৯৪০-এর সেনসাস রিপোরট অনুযায়ী হাতি, দেখা যাচ্ছে সংখ্যা ৪৩০। গণ্ডার ৬৭০। বুনো মোষ ছ শর ওপর। নানাজাতের হরিণ তো অসংখ্য। ভল্লুক আছে ৩০টি। অন্তত ৭২-এর গণনায় ছিলো। বাঘ ছিলো গোটা তিরিশ। চিতা দশ। বুনো শুয়োর পাঁচসাত শ।

এইসব। গৌহাটি থেকে বাসে ঘণ্টা ছয়েকের মতন। জায়গাটার

আসল নাম কোহোরা। ছোট্ট জনপদ। হেলথ সেনটার আছে। ডাক্তার আছেন একজনই। একটিই সাইকেল রিক্সা। গাছের ছায়ায় সেই রিকসাটি ঝিমুচ্ছে দেখে, রিকসঅলার খোঁজ করলাম। ঘুম ভেঙে বেরুলো লোকটি। গায়ে টেরিকটনের ঝলমলে গেঞ্জি। পরণে প্যাণ্ট, পামসু। শুভ্রপৈতে কাঁধের ফাঁকে। জাতব্রাহ্মণের ছেলে রিকশা টানবে তো? নাকি, ওঁকে ব সয়ে আমাদেরই টানতে হবে? ছকুলাল কুশীপ্রাঙ্গণ থেকে এসেছে। চা বাগানে কাজ করতো। পয়সা জমিয়ে স্বাধীন ব্যবসায় নেমেছে। ভালোই আছে। দেশে খেতখামার আছে, ছেলে বউ। মধুবনী থেকে কোশ চারেক গেলেই তার গাঁ। বছরে দুবার যায়। একমাত্র রিকশায় মালপত্তর আর বৌবাচ্চাদের তুলে পিছন থেকে ঠেলতে-ঠেলতে আমরা তিনজন।

বাংলো বাঁহাতি টিলার মাথায়। পথ পেঁচিয়ে উঠছে। ডানহাতি তুমুল চাবাগান। কালচে নীল বৃষ্টি ধোয়া বাগানের চেহারাই আলাদা এখন। শেড-ট্রির সারি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে পাতা ঝরাচ্ছে। এই তার কাজ। বাঁদিকে পাহাড়ি নদীর কোলে কালো ছেলেমেয়ের দল নাইতে নেমেছে। নীল জল নুড়িপাথর বাজাতে-বাজাতে নিচে নামছে। উৎস মিকির পাহাড়। বাংলোর পিছন দিকে মাইল আট-দশ দূরে তার পদতল, সানু। মিকির পাহাড় থেকে পাথরের মতন হাতির পাল নেমে আসে। লক্ষ কাজিরাঙার জঙ্গল। জঙ্গল থেকেও হাতি আকছার পাহাড়ের দিকে। নির্দিষ্ট পথ আছে। ধানক্ষেত আর ভুট্টার সুগন্ধ মাঝে মাঝে তাদের পথ ভোলায়। মানুষের ক্ষেতখামার তখনই তছনছ। তা না হলে এই অন্যমনস্ক প্রাণী কারুর কোন ক্ষতি করে না।

উপরে উঠতে বাঁহাতি একসার গাছ। উ'ওয়ারডস গ্রাইপ ওয়াটারের ক্যালেনডারে যে শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছে, পাতার রং ঠিক ঠিক তার গাত্রবর্ণের মতো। ছকু বললো, এর নাম মালশ্রী। বুঝলাম, তমাল। তমাল ছাড়া এমন রং কার হবে?

তমালশ্রেণীর নিচে একটা খোঁয়াড়। খোঁয়াড়ের মধ্যে দুটি গণ্ডার। আটক করে রাখা। জঙ্গল থেকে ধরা হয়েছে। শুনলাম, চণ্ডীগড় যাবে। চিড়িয়াখানায় থাকবে। কাজিরাঙা থেকে এমন অনেক যায়। যাক, সে-কথায় পরে আসছি।

আসার পথে দু জায়গায় বাস থামিয়ে বাঁহাতি তৃণভূমিতে গণ্ডার দেখলাম দু দুবার। গাইবাছুরের মতন চরে বেড়াচ্ছে নিঃসঙ্কোচে। পথের পাশেই চলনবিল। হয়তো পার হয়ে রাস্তার ওপর এসে পড়ে না জল ঠেঙিয়ে। গমমকালে আসতেও পারে। বাসের মুখোমুখি থমকে দাঁড়ায়।

বাস থেকে নেমে পথের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথা নিচু ঘাস খেয়ে চলেছে তো চলেইছে। ড্রাইভার হর্ন দিতে, একবার মাথা উঁচু করলো। আবার তাচ্ছিল্যভরে খাওয়া। ভাবা যায় না। মাত্র ক'হাতের মধ্যে ছাড়া-গণ্ডার এভাবে দেখিনি কখনো। জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে গণ্ডারের পাল দেখে বেড়িয়েছি বটে, কিন্তু, এভাবে রাস্তার পাশেই! তবে কি জঙ্গল শুরু হয়ে গেলো! এতো তাড়াতাড়ি? এরই মধ্যে একটি দুটি মেটেঘর খড়ের ছাউনি চোখে পড়লো। চালের ওপর লাউটা কুমড়োটা। মানুষ এই হিংস্র জন্তুজানোয়ারের পাশাপাশি কীভাবে থাকে?

শচীন বললো, এরা চাষবাস করে। টিন বাজিয়ে হাতিগণ্ডার তাড়ায়। মারে এবং মরে। উপায় কী? স্যাঙ্কচুয়ারির চৌহদ্দির ঠিক বাইরেই এমনি কতো লোকের বাস, গেলেই দেখতে পাবে।

পথে বোগোরিতে একটি বীট-অফিস। বন বিভাগের। কাজিরাঙা এখন এখান থেকে ১০।১২ কিলোমিটার হবে। বীট অফিসার থাকেন। তাঁর হেফাজতে চারটে হাতি। এই হাতি জঙ্গল ঘোরাবে। ইনসপেকশন বাংলোও একটি আছে এখানে। এখান থেকে জঙ্গলে ঢোকা যেতে পারে। অনেকে কাজিরাঙার দলে এদিক দিয়ে ঢোকে।

ফরেস্ট অফিসার ছিলেন জগদীশ ফুকন। অরণ্যপ্রেমী মানুষ। কাজিরাঙাকে লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসার ব্যবস্থায়, তাঁর দান অপরিসীম। চাকরি থেকে অবসর পেয়েও তিনি জঙ্গল ছাড়তে পারলেন না। গৌহাটিতে বাড়ি পড়ে রইলো। তিনি চলে এলেন এই প্রিয় জঙ্গলে। হোটেল বানালেন। বৌ ছেলেপুলেও পর্যটকদের দেখাশোনা করেন। মিউজিয়ম তৈরী করেছেন তিনি। কতো ফিলম করেছেন। সেই সমস্ত দেখেশুনে ভ্রমণকারী আর অন্যত্র যান না। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! কাজিরাঙা পর্যন্ত যাবার আগেই পর্যটক একদিনের জন্যে এখানে নেমে পড়ুন।

সাতাত্তরের মে মাস। ১৯ তারিখে গিয়ে পৌঁছুলুম কাজিরাঙা। সুনীল শীর্ষেন্দু অমিতদা কলকাতা ফিরে গেছেন আগের দিন। সুনীলের কাছে অরুণ বাগচীর একটা হাতচিঠি পাঠিয়ে দিলুম আমাদের আনন্দবাজারের বার্তাসম্পাদকের নামে। ফিরতে দেরি হবে কিছু। মোটামুটি বলেই এসেছিলুম। তো এখন, গিঁঠের ওপর আর একটা গিঁঠ দিয়ে দিলুম। এই আর কী? আগেকার ব্যবস্থা থাকলে তো অমিতদা ব্যাপারটা বুঝেই যেতো। হয়তো একবার বলতো এবছরের মধ্যে ফিরো অন্তত। তাহলেই হবে। এখন তো উনি আমাদের ছেড়ে পাড়া ছেড়ে বেপাড়ার কাগজের কর্ণধার।

ওরা কলকাতা পৌঁছে এতক্ষণে যে যার ঘরে ডেসকে বুক চেপে বসে গেছে। ডেসকের কাঠ বুকের ভেতরে ঢুকছে। আর আমি ঘুরতে চলেছি জীয়ন-কাঠের জঙ্গলে। মরা কাঠ বুক থেকে খুঁচিয়ে বের করার এই একটা সুযোগ। ওদের সমর্থ ছিলো না। তাই হেরে গেলো আমি জিত্ তাল খেলতে নেমেছি। খেলায় হার না-পছন্দ।

মীনাক্ষী আর ছুটো বাচ্চাকে ট্যুরিস্ট লজের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। চান সেরে নিক। ধোয়া পাকলা করতে থাকুক।

মোটামুটি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে, আমরা যাবো ফুল কুড়োতে। খবর দেওয়া না থাকায় এবং গতকালের খাবার-দাবার নষ্ট হওয়ায় খাবার কথা তেমন কিছু বলা গেলো না। টোষ্ট আর ওমলেট এই দিয়ে দুপুরের ভোজ চুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে আমরা তিন উল্লুক— আমি শচীন আর সুকুমার (অনুল্লুক বেচারা) গড়িয়ে নিচে নামতে থাকলুম। উদ্দেশ্য ভালো। শচীন জানে আমি জানি। সুকুমার আঁচ করতে পারে নি হয়তো। আমরা ধাবায় খাবো। প্রেকারেবালি, রুটি এবং সবজি যদি কিছু মেলে এবং সবজি-উবজি যদি কিছু মেলে এবং জল-উল যদি পাওয়া যায়। মীনাক্ষীর ঠিক চক্ষের সামনেই দুপুরে উন্মাদনা করতে বিবেকে বাধতো। তাই স্নানঘরে ঢুকিয়ে, আমরা এক্ষুনি আসছি বলে তড়িঘড়ি নিচের রাস্তার দিকে।

ট্যুরিস্ট বাংলোর একটু চিত্তির কাটি। দোতলা সুন্দর। নিচে কাউনটার। দুদিকে ফুলবাগান। ঘাসপরা ফাঁকা জমি। আম গাছে আম। পোরটিকোয় টেবিল চেয়ার সোফাকৌচ। লোহার গেটে দেয়াল-ঘেরাও বাংলো বাড়ি। ১ নম্বরী বাংলোয় বেশ কয়েকটা ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। মোট দুটো পর্যটন বাংলো আসাম রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে। খাট বিছানা জল আলো সমস্তই বহাল। খানাপিনা দিশি—বিদিশি দু মতোই। থাকার জন্যে আগাম লিখে রিজারভেশন করতে হবে, ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার কাজিরাঙা (ফোন কাজি-৩) পোঃ অঃ কাজিরাঙা স্যাঙ্কচুয়ারী এছাড়া, ডিরেকটর অফ ট্যুরিজম, আসাম। যশোবন্ত রোড, পানবাজার। গৌহাটি ১। ফোন : গৌ ১৭০২। দশ দিনের মধ্যে আগে অন্তত রিজার্ভেশনের জন্যে চিঠি দেওয়া জরুরী।

স্যাঙ্কচুয়ারিতে বন্যপ্রাণী দেখতে যাবার জন্যে হাতি ছাড়াও একটি জিপ আর একটি মিনিবাস চালু। বনবিভাগের অধীনে।

অন্যান্য থাকার জায়গা : বনবিভাগীয় বাংলো, রয়েল কনজারভেশন বাংলো। জঙ্গলের মধ্যে আরিমোরায়, একটা বনবাংলো

আছে। বগোরি বাংলোর কথা তো আগেই বলেছি। চা বাগান দেখা এবং চা প্রসেসিং চাক্ষুষ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কাছাকাছি আদিবাসী গ্রামগুলোতে বেশকিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

১৯৭২-এর সেনসাস রির্পোটে যা পেয়েছি তা নিচে তুলে দিলাম :

উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যস্থান

গণ্ডার	৬৭০		
হাতি	৪৩০	মিহিমুখ	৩ কিমি
বুনোমোষ	৬০০	কাথপাড়া	৫ ,,
গৌর	১৮	দাফলং (১)	৭ ,,
সোয়ামপ ডিয়ার	৫২০	মোনাবিল	১৭ ,,
হগ ডিয়ার	৬০০০—৮০৫০	বিমলি	২৩ ,,
বার্কিং ডিয়ার	১০০	দাফলং (২)	২৯ ,,
বুনো শুয়া	৫৫০-৬৫০	কাঞ্চনজুরি	৩৭ ,,
সম্বর	২০০		
ভাল্লুক	৩০		
বাঘ	৩০		
চিতা	১০		
অট্টার	২০০—৩০০		

শচীন বেশ কয়েকবারই কাজিরাঙা গেছে। কাগজের লোক এবং স্থানীয় লোক। সেই হিসেবে কনজারভেটর থেকে শুরু করে বনপ্রান্তের রেনজার পর্যন্ত তাকে চেনে। কোন্ ধাবায় কী খাবার পাওয়া যাবে, কেমনতরো বিষ মিলবে সবই তার নখদর্পণে।

সেই শচীনকে নিয়ে বাংলো এলাকা ছেড়ে পথের ধারের ধাবায়। একটিই ছিলো। শচীন আঙুল তুলে দেখালো, ওটা নতুন। আমাদের পুরনোই ভালো। ওখানেই যাওয়া যাক।

সারবন্দী খাটিয়া। ঘড়ি ছটোর দিকে হেলে পড়েছে। বিকেল

হতে বেশি বাকি নেই। শচীন দু প্লেট আলু কেটে ভাজিয়া বানাতে বললো। দু প্লেট তড়কা। পিঁয়াজ টম্যাটোর চাক্‌লা—ওপরে নুন ছড়ানো, নেবু টেপা, ব্যস। কিছুক্ষণ পরেই উঠলো শচীন। একটু অন্দরমহলের দিকে। তারপরই হাতে দুটি বোতল ঝুলিয়ে, বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে—কে? না শচীন। তরল আগুন গলাধঃকরণ করে শরীর টেনে তমালের ছায়া-হাওয়া লাগাতে-লাগাতে ওপরে।

ততক্ষণে, মীনাক্ষী আর বাচ্চারা মোটামুটি সুস্থ। আমাদের জন্যে সস্তা-গণ্ডার ফরেস্ট বাংলো ঠিক করা হয়ে গেছে। তিন রাত ওখানে অনায়াসে কাটানো যেতে পারে। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি, আপাতত একটা রাত কাটাবো। পরদিন ভোরে হাতির চূড়োয় উঠে জঙ্গলের মধ্যে। রেনজার সায়েব এসে গেছেন বোঝা গেলো। এসেই ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। খবর পেয়ে গেছেন, একদিন দেরী হলেও আমরা এসে গেছি। চীফ কনজারভেটর ইসলাম সায়েব খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। তবে তাঁর বন্ধু আমার বন্ধু। সেই বন্ধু সহকর্মীর নাম অরণ্যপ্রেমী মাত্রেই জানেন। তাঁর নাম হামদি বে। দীর্ঘদিন আসামের পাহাড়-জঙ্গলে কাটিয়ে গেছেন। এককালে। হামদির চিঠি ইসলাম সায়েবকে দিয়েছে শচীন। শুধু দেখাটাই হয়নি। ফিরে দেখা করবো। আমাদের সঙ্গের অর্ধেক তল্পিতল্লা মালিগাঁও-এ জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য মশায়ের বাসায় রেখে এসেছি।

শচীন এল ঠ্যাং ধরে মস্ত একটা মুরগি নিয়ে। এক বি-র চৌকিদারকে রান্নার নির্দেশ দিয়ে বারান্দায়। পাশাপাশি চার পাঁচটি ডেক চেয়ার। কাঠের বাংলো বাড়ি। সুন্দর, ছোট্ট, ছিমছাম। পিছনে জঙ্গল। এবং তার ভিতরে মুখ লুকোনো ঝর্ণা।

ঝর্ণার তিরতিরে শব্দ কানে আসছে। অচেনা পাখি-পক্ষী ডেকে উঠছে। মরে আসছে বিকেল বেলা। সন্ধে হবে।

টুরিস্ট নেই। বাংলোর সামনের ট্যুরিস্ট লজে দু তিন ঘরে দু চারজন নির্জন মানুষ। আর কেউ নেই। বাকি আমরাই। বাঁচাতে আমরা, মারতেও আমরা।

ম্যেনজার সায়েবের নাম স্যুমুয়েল। শচীনের আখেরি দোস্ত। বাংলো ভাড়া খুবই শস্তা। দিনে ১৫ টাকা। খাবার ব্যবস্থা চৌকিদারের হাতে। ভাত ডাল আর মুরগির লম্বা ঝোল।

কাল কী হবে?

কালকের কথা কাল। আজ যদি বেঁচে থাকি, তবেই না! বললো শচীন। স্যুমুয়েল এলো সন্ধেয়। আমরা আসরে বসে গেছি। টেবিলের নিচে গুটিগুটি বেড়ালের মতন অন্ধকার এসে জুটছে। চারদিক চেপে-ঠেসে আসছে জমজমাট কালো। তারই মধ্যে টিপটিপে জোনাকির মতন আলো—চাবাগানের। কুলি ধাওড়ার। বাংলোর দুটি ঘর। পাশাপাশি। মাঝখানে ডাইনিং। বসার জায়গা বারান্দার কোণ। সামনে ফুলের টুকরো-টাকরা পাপোষের মতন জমিতে ফুল ফুটে নেতিয়ে পড়েছে। শচীনের পেটে একটু পড়লেই জীবনানন্দের কবিতা। তারপরই রবীন্দ্রনাথের গান। মধ্যরাত পর্যন্ত সেই তীব্র অভিমানভরা গলায় গান চললো। একসময় টেবিল ফাঁকা হলে, শচীন হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো, আরো উপরে। কাঠের গোল টুঙি। কাঠের বসার জায়গা। চমৎকার রং-ঝলমলে দেয়ালের ভেতর, দেয়ালের বাইরে। কাগজ ফুল দুলছে মৃদু হাওয়ায়। ঐ কাঠ-টুঙিটা হলো বার-হাউস। গল্পের পায়ের মতন চেহারা। সেখানে আধঘণ্টাটাক কাটিয়ে আবার বারান্দায়। বারান্দার কোণে। আবার গান। মধ্যরাত কাবার। পরদিন ভোরে উঠতে হবে বলে, যেন অনিচ্ছায়, শুতে

যেতেই হলো। বাচ্চারা ঘুমিয়ে। একটু ঠাণ্ডাভাব এখনো আছে। যাই-যাই করেও শীত যেতে চাচ্ছে না।

২০ তারিখ ভোরবেলা। ঐ অতো রাত করে ঘুমিয়ে কী সহজে ওঠা গেলো! সে কী শীতের কুয়াশা ভাব এখনো বহাল আছে বলে? শীতে, দেখেছি, অনেক বেশি পরিশ্রম করা যায়। রাত দুপুরে শুতে গিয়ে তাই বোধহয় আঁধার থাকতে-থাকতে উঠেছি। বাচ্চারা ভালোই ঘুমিয়েছে।

স্যমুয়েল বলে গিয়েছিলেন, ভোরবেলা জিপ পাঠিয়ে দেবো। হর্ন বাজিয়ে ঘুম থেকে তুলবে। তারপর আপনাদের নিয়ে জঙ্গলে যাবে। সেখানে 'শাজাহান' অপেক্ষা করে থাকবে। শাজাহানের পিঠ চড়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকবেন। খুব পুরনো হাতি। বয়েস পঞ্চাশ হবে। যোলোটা হাতি আছে। দুজন একটু অসুস্থ। নামগুলোও কী সুন্দর! জয়শংকর, জয়মালা, জয়তারা—এই ভাবে। জয় দিয়ে শুরু। মাদি হাতি বা হাতিনীই জঙ্গল নিয়ে যাবার পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

শচীন আর সঙ্গ নিলো না। ও অন্য তালে আছে।

বললো, হাওদায় আমি না গেলে তোমরা আর একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেতে পারবে। বিশেষ করে বাচ্চারা আছে তো? ওদের জন্যে সবসময়েই একটু বেশি জায়গা চাই। যতো ছোট্ট, ততোটা বড়ো জায়গা লাগবে।

শচীন গেলো না। অনেকবার গেছে।

আমরা বাংলো থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকে। মূল জঙ্গল রাস্তার ওদিকেই। বাংলোর সামনে পাহাড় শ্রেণী আর ছাড়া-ছাড়া জঙ্গলের নাম মিকির পাহাড়, মিকির জঙ্গল। ওখান থেকে হাতি নামে আকছার, কাজিরাঙা থেকেও যায়। তাদের যাবার নির্দিষ্ট পথ আছে। হাতির পাল সেই পথেই আসা যাওয়া করে।

জঙ্গলে ঢোকার দুদিকে গাছপালা। গাছপালা ছাড়ালে ইতস্তত ঘাসবন, তৃণভূমি। কোমর সমান এই ঘাসের নাম 'টাইগার গ্রাস'। বাঘ এই তৃণভূমিতে লুকিয়ে থাকে। গণ্ডার পাক মারে। সাপ খোপ চুপচাপ পড়ে থাকে। হরিণ ঘুরে বেড়ায়।

এবছর বৃষ্টির যেন আর শেষ নেই। জঙ্গলের অর্ধেক ডুবে গেছে। জন্তু জানোয়ারা বেশির ভাগই পাহাড়ে আর উঁচু জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তৃণভূমি জল থই থই। জল আর কাদা, পাঁক। শাজাহান ধীরে ধীরে ঘাস ভূমিতে নেমে পড়লো। জিপ দাঁড়িয়ে থাকলো আমাদের জন্যে। ফেরার জন্যে দরকার।

একটা বাঁধানো টুঙি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। দোতলার গায়ে শাজাহানকে নিয়ে এলো মাহুত। আমরা ওপর থেকে তার পিঠে চড়ে বসেছিলাম। সব চেয়ে বড়ো, ধীর স্থির, অভিজ্ঞ হাতি। জিপ নিয়ে স্যমুয়েল নিজেই এসেছিলেন।

পাঁকে জলে শাজাহানের ভারি পা গেঁথে যাচ্ছে। সাবধানে তুলে আবার ফেলা। আস্তে ধীরে এগোনো। পর পর হাতি বেরোয় ট্যুরিস্ট নিয়ে। মোটামুটি আগুপিছু করে থাকে। একত্র থাকে। যাতে একের বিপদে অন্যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারে। জঙ্গলে অজানা কোণ থেকে বিপদ এসে পড়তে পারে। কখন আসে, জানান দিয়ে আসে না। সব মাহুতের পেছনেই একজন বন্দুকধারী গারড। আমাদের হাতিতে দুজন।

হেলতে দুলতে শাজাহান চলেছে।

সামনেই শান্তিভঙ্গের বিরক্তি চোখে নিয়ে দুই গণ্ডার। ঘাসবনের মধ্যে গোটা শরীর। গলা ঘাড় মুখ বেরিয়ে ভুষো কালো টিলার মতন চেহারা। দু পা এগিয়ে আসবে কিনা ভাবছে, শাজাহান হেঁকে উঠলো, তফাৎ যাও। গণ্ডার দুটো দৌড়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেলো। ওদিকে বিলের পাড়ে দু তিনটি, গলাজলে গুটি কয়— স্নান সারছিল বুঝি! আলস্যে অবহেলায় আমাদের দিকে

একবার তাকিয়ে নিজের নিজের কাজে মন দিল। পাড়ের ওপরে যে দুটি, তারা ক্যামেরার জন্যে পোজ মারছিল। আমার হাত কাঁপে। তবু, তারই মধ্যে যতো চটপট পারা যায় কয়েকটা স্ন্যাপ নিয়ে নিলাম।

বিলের মধ্যে একটা শুশুক ভেসে উঠলো। পালে পালে হাঁস পাখি বেড়াচ্ছে ভেসে। কাচস্বচ্ছ জল। কাঠের ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে রূপোর পাতের মত ঝিকমিকে মাছ। বড় বড় মহাশোল ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরা বারণ। তারই মধ্যে চুরি করে ধরছে বহুলোক। কতো নানারকম পাখি ডালপালায়, জলে। সবার নামও জানি না।

আমরা তৃণভূমি আর পাত্‌লা জঙ্গলের মধ্যেই ঘুরলাম ঘণ্টা দুই। ঘনজঙ্গলের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যাবার অসুবিধে অন্যসময় হলে থাকতোই না, তবে এখন বৃষ্টির জমা জল গোটা জঙ্গলেই। জন্তুজানোয়ার সবই পাহাড়ে, উঁচু জায়গায়। দেখতে পাবার অসুবিধে। নানারকম হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে তৃণভূমি জুড়ে। গাই-বাছুরের মতো গণ্ডার। আর কিছু নয়। আর কিছুই আমরা দেখতে পাইনি। বুনো শুয়োর দেখেছি। সজারু আর বনমুরগি তো গাঁ গেরামের বাগানেই দেখা যায়।

ঠিক ছিলো জঙ্গল দেখে ফিরে সেদিনেই বেরিয়ে পড়তে হবে। শচীন সুকুমার ফিরবে গৌহাটি। আমরা উঠে যাবো ওপরের দিকে। জোড়হাট শিবসাগর ডিব্রুগড় হয়ে তিনসুকিয়া।—সেখান থেকে দুলিয়াজান। দুলিয়াজানের গায়েই শুরু অরুণাচল রাজ্য। এবার অরুণাচলের বদলে, ঠিক করা আছে নাগাল্যানড আর মণিপুর যাবো। চিঠি চাপাটি লিখেছি কলকাতা থেকেই। শিলং-এ এসে পোস্ট এ্যানড টেলিগ্রাফ থেকে পি এ টু দি কমিশনার কুলরঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে সঙ্গে কথা বললাম। ডিমাপুর কবে নাগাদ

পৌঁছুবো, জানালাম। ওর হেড কোয়ার্টার কোহিমা। ও আমাদের জন্যেই ডিমাপুর নামবে। ফর্মাল পারমিট লাগবে নাগাল্যানডে ঢুকতে।

৯টা নাগাদ বেরোবার জন্য তৈরি! রেনজার সুমুয়েলের ডেপুটি যাচ্ছেন জোড়হাট বিমানবন্দর—একদল মারকিন ন্যাচারালিস্টদের আনতে। আই টি ডি সির বাংলোও তাদের ঐ বড় দলের জন্যে পুরোপুরি রিজার্ভ। সাতদিন থাকবেন।

এইসব আলোচনা করতে করতেই ডঃ ব্যানার্জির কথা উঠলো। ডঃ রবিন ব্যানার্জি। একদিকে উনিশটা চা বাগানের প্রধান চিকিৎসক। অন্যদিকে ভারতীয় ন্যাচারালিস্টদের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত মানুষ তিনি। থাকেন গোলাঘাট। আমরাও গোলাঘাট ছুঁয়ে যাবো। সুতরাং ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে যাবার সুযোগ ছাড়বো কেন? ওঁর কথা এতো শুনেছি। ওঁর লেখা পড়েছি। ছবি বিদেশ ছাখে। আমাদের দুর্ভাগ্য, পশুপাখি জন্তু জানোয়ার নিয়ে ওঁর তোলা ছবি আমরা দেখতে পাই না। তার কোন ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে যখন ট্যুরিস্ট লজে আনন্দবিধানার্থে ছবি দেখানো হয়। পশু-পাখির আচার-ব্যবহার নিয়ে তাঁর তোলা ছবি এবং অন্যান্য এই ধরণের ছবি দেখানো হলে ক্ষতি কী?

দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ গোলাঘাট পৌঁছুলাম। এক ডাকে সবাই ওঁকে চেনে। আমরা পথ নির্দেশ নিয়ে ওঁর বাড়ির দরজায়। বিশাল বাড়ি। মাথার চূড়ায় টালি। দেয়ালের গায়ে ঠাসা-চাপা লতা। সামনে ফুলবাগান। বিশাল চৌহদ্দি। মালিরা বাগানের এদিক-ওদিকে নেমে কাজকর্ম করছে।

বেল বাজাতে চাপরাশি এসে সামনের ঘরে বসালো। উনি এলেন একটু পরে। হয়তো ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হলো। উনিই বলছিলেন। আমরা শুনে যাচ্ছিলাম। বয়েস? তা, ষাটের কোঠায় হবে। বিয়ে-থা করেন নি। একা

থাকেন। অতিথিদের জন্যে তিন-চারটি ঘর। সংকারের ব্যবস্থা তাঁর। সময় ছিলো না। বললেন, যদি ফেরার পথে এসে একটা দিনের জন্যেও তাঁর ওখানে থাকতে পারি, তাহলে খুশি হবেন।

বৈঠকখানায় অন্য সাজসজ্জা ছেড়ে দিয়ে, একটা জিনিস নজর কাড়বেই, তা হলো এক বিশাল দেয়াল জুড়ে নানা দেশ থেকে আনা বাহারে পুতুল। কাঠের লম্বা প্যানেল করে সাজিয়ে রেখেছেন। এক ঝলকেই মানুষের রুচিবোধ সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ। এদেশে থাকেনই কম। আজ আফ্রিকা তো কাল দক্ষিণ আমেরিকা। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, যেখানে তিনি যান নি। শহর-বাজার নয়—বনজঙ্গল নদীখাঁড়ি—বাঘসিংহ থেকে কুমিরকামট তাঁকে টানে। এই টানের জন্যই আর সংসার পাতা হয়নি। সংসারের টান এর কাছে কিছুই নয়।

উনি তো বলেই খালাস। আমি আসতে-থাকতে ভয় পেয়ে গেছি। মীনাক্ষীর মুখে শুনলুম, তিতি আর তাতার টয়লেটে গিয়ে, সুন্দর করে গোছানো বেশ কিছু ষ্টিকার উপড়ে ফেলেছে। প্রতিটা বর্গমারবেলে ষ্টিকার লাগিয়ে চমৎকার এফেকট আনা হয়েছে। এমন অদেখা নানা সুন্দর জিনিসে গোটা বাড়ি ভর্তি। ছাইদানই আছে বিভিন্ন রকমের। বাড়িটায় কী আছে, না আছে এবং কেমনভাবে আছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এই কাজিরাঙার পিছনে, তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা না থাকলে, আজকের কাজিরাঙা এমনটা থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ। তিনি এবং জগদীশ ফুকন—এঁদের মানসসন্তান এই কাজিরাঙা অভয়ারণ্য।

ডঃ ব্যানার্জি এক ধরণের বিষাক্ত হিংস্র সরীসৃপের কথা বলছিলেন, যা কাজিরাঙাতেই তিনি অনেক দেখেছেন। সেই 'মনিটর লিজার্ড' হাতিকে তাড়া করে গেলে হাতি প্রাণভয়ে দৌড়ে পালায়। এতো তেজি তার বিষ। এতোই হিংস্র সেই প্রাণী। সাধারণ

টিকটিকির দেড়া হবে আয়তনে। দৃশ্যত খুব নিরীহ, কিন্তু এমনই প্রতাপ তার। ডঃ ব্যানার্জি এর উপর ছবি করে রেখেছেন। গণ্ডারও কম ভয় পায় না। গায়ের চামড়া যতোই মোটা হোক কেন তার।

ডঃ বলছিলেন, এই সরীসৃপটি ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পৃথিবীতে এমন প্রাণী অসংখ্য, যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে, বছর কয়েক বাদে তারা শুধু ইতিহাস হিসেবেই বেঁচে থাকবে। ছবিতে থাকবে।

খুব চেষ্টা করবো আসতে, বলে বিদায় নিতে দেরগাঁও হয়ে জোড়হাট। এখান থেকে তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস বাস ধরবো। জিপ ছেড়ে দিলাম। স্টেট ট্রান্সপোরটের জোড়হাট টার্মিনাল স্টেশনের মতো এতো বড়ো আর ছিমছাম টার্মিনাল আমি কখনো দেখিনি। ফুসফুসের মতো কেন্দ্রে বসে নানা শিকড়ে প্রাণ সঞ্চালন করছে জোড়হাট টার্মিনাল। চমৎকার লাগলো। ওখান থেকে বাসে চেপে তিনসুকিয়া। সেখান থেকে ভাড়ার ট্যাক্সিতে দুলিয়াজান রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। আপাতত যাত্রাবিরতি। বিশ্রামের বিরতির পর আবার দৌড়। মনে মনে চেষ্টা, দুর্গানাথ প্রণতিকে নিয়ে সদলবলে ডিমাপুর। সেখান থেকে কোহিমা। হোটেলে ও অন্যান্য বিবরণ নির্দেশিকায় দেখুন।
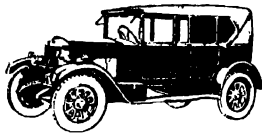
একঝলকে শিবসাগর

জোড়হাট এয়ারপোর্ট থেকে শিবসাগর ৫৫ কিলোমিটার। একেবারে জাতীয় সড়কের ওপর। এছাড়া বাস আছে নিয়মিত। ট্যাক্সির ব্যবস্থাও আছে। শিবসাগর ট্যুরিষ্ট অপিসে ফোন করে দেখা যেতে পারে। ফোন : শিবসাগর ৩৯৪। কিংবা, কাজিরাঙা-৩।

শিবসাগরের সাগরের পাশে ছোট্ট কিন্তু সুন্দর ট্যুরিষ্ট বাংলো। তিনটে ডবলঘর। চারটে একানে। খাবার দাবারের ব্যবস্থা লজেই আছে। রিজার্ভেশন : ইন চারজ ট্যুরিষ্ট বাংলো, শিবসাগর। আগাম করে রাখাই ভাল। এছাড়া, থাকার জায়গা বলতে সারকিট হাউস আর ডাকবাংলো। এ দুটোতে থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে মহকুমা শাসক (এস ডি ও) শিবসাগরকে লিখতে হবে। কিছু কিছু চলনসই হোটেল আছে।

ইংরেজরা আসার আগে অহোম রাজাদের রাজধানী ছিলো এই শিবসাগর। সাগরকে কেন্দ্র করেই শিবসাগর শহর গড়া হয়েছিলো, আজ থেকে দুশো বছর আগে। দীঘি বা সাগর যে নামেই ডাকা হোক না কেন, ১২৯ একর জুড়ে এই জলাভূমি এবং শহরের মাঝখানে অবস্থিত। মাঝখানে এবং শহরের লেভেল থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। স্বাভাবিক দীঘি নয়, মানুষের কীর্তি। মানুষের হাতে খোঁড়া। তবে, স্বাভাবিক ঝর্ণা ছিলোই। সেই ঝর্ণাগুলোকে কেন্দ্রে রেখে দীঘি খোঁড়া হয়েছে। তিন পাড়ে তিন মন্দির। শিব মন্দির, বিষ্ণুমন্দির আর দেবীদোল মন্দির। শিব সিংহের পত্নী রাণী মদাম্বিকা ১৭৩৪ সালে এই তিন মন্দির নির্মাণ করান। ভারতে

যতো শিবমন্দির আছে, শোনা যায়, এটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু।

(১) তলাতল ঘর—রাজা রুদ্র সিংহ ১৬৯৯ সালে এটি তৈরি করান। শিবসাগর থেকে ৬ কিমি দূরে। মাটির নিচে তিনতলা দুর্গসদৃশ বাড়ি। সেনাবাস। নিচতলার সঙ্গে সুড়ঙ্গপথে দিখাও নদীর সঙ্গে যুক্ত।

(২) কারেং-ঘর—সাততলা দুর্গ। মাটির নিচে তিনতলা, উপরে চার। একটি দিখাও নদী, অন্যটি গারগাঁও প্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত। শহর থেকে ৯ কিমি। জাতীয় সড়কের কাছে।

(৩) রঙ্গঘর—অহোমরাজ প্রমত্ত সিংহ এটি তৈরি করান। দোতলা দালানকোঠা থেকে রাজারা হাতির লড়াই প্রভৃতি খেলাধুলো দেখতেন। চারদিকে ধ্বংসাবশেষ। গোলাঘর, রঙ্গনাথ শিবের মন্দির, হরগৌরীর মন্দির—এইসব।

(৪) জয়সাগর তলাও আর মন্দির—৩১৮ একর জমি নিয়ে বিরাট দীঘি। ৪৫ দিনে এই দীঘি কাটা হয়েছে। রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ তাঁর মায়ের স্মৃতিতে ১৬৯৭ সালে এটি খনন করান। দীঘির ধারে জয়দোল (বিষ্ণু) মন্দির, শিবমন্দির, দেবীঘর, ঘনশ্যাম মন্দিরও তিনি তৈরি করিয়ে দেন।

(৫) গৌরীসাগর—শিবসাগর থেকে ১৬ কিমি দক্ষিণে আসাম ট্রাঙ্ক রোডের গায়ে এই ঐতিহাসিক দীঘি তৈরি করেন রাণী ফুলেশ্বরী, ১৭২৩ সালে। ১৪০ একর জায়গা জুড়ে। নিচে ঝর্ণা। তীরবর্তী বিষ্ণু শিব ও দেবীমন্দির দ্রষ্টব্য। জয়সাগর আর গৌরী সাগরের মধ্যে পড়ছে অথৈ সাগর ও রুদ্রসাগর। রুদ্রসাগরে একটি মন্দিরও আছে।

(৬) গারগাঁও রাজপ্রাসাদ—শিবসাগরের পুবে ১৩ কিমি পথ গেলে অহোম রাজাদের প্রধান শহর। ১৫৪০ সালে রাজা সুকলেন সিং তৈরি করিয়েছিলেন। বাড়িঘরদোর সবই ধ্বংসের করাল গ্রাসে।

আমি জঙ্গলের গল্প ফেঁদে বসিনি। বলতে বসেছি তাদের গল্প যারা এই জঙ্গলের মধ্যেই, পাহাড়ের ছায়ার বসে ঝোরার শীতল জল ছিটিয়ে ক্ষেতখামার গড়েছে। কালোর দিকে গড়িয়ে পড়ছে যে-সবুজ, সেই সবুজ-কালো শান্তি ওদের মুখে লেপাপোঁছা। মানুষগুলোর ঘরগেরস্থালি দেখলে চক্ষু জুড়োয়। অনেক ক্ষেতখামার আর ঘর ঘুরে বেড়ানো লোক আমি। হঠাৎই এসে পড়ে মনে হলো যেন, স্বর্গের রং সবুজ হতে বাধ্য। সবুজ, কিন্তু কালোয় ঘেঁষে সবুজ।

কী ভাবে এলাম একটু বলি। আপনাদের মধ্যে কেউ, ইচ্ছে করলে, ছুটো অবকাশের দিন পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন। চলে আসুন সোজা। ঝাড়গ্রাম ষ্টিলে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ। তিন ঘণ্টায় পৌঁছে দেবে। ঝাড়গ্রামে বাংলো আছে। রাতটা বাংলোতে কাটাতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয়, দেবেন আচার্যি-মশাইকে একটি চিঠি ছাড়া। শান্তিনিকেতন বোর্ডিং-এর পুরানো বাড়ীর পাশে নতুন ছুতলা বাড়ি উঠছে। ঝকঝকে বাড়ি। সঙ্গে আলাদা বাথ। খাটবিছানা মশারি সব আছে। বিজলী বাতি আছে। খোলা বারান্দা আছে। সুস্বাদু খাবার আছে। মাছ ভাজা, মাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি। যা খাবেন— সবই পাবেন। সেই সঙ্গে দরদ। এমন দরদী হাতের সেবাযত্ন 'আচার্যি-নিকেতন' ছাড়া আপনি কোথাও পাবেন না।

এবারে ব্যবস্থা করতে হবে একটি জিপ! তাও, আচার্যি-মশাইকে একবার বলে দেখতে পারেন। ঝাড়গ্রাম থেকেই পেতে হবে। বেলপাহাড়ি পর্যন্ত বাসে যেতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকে? আরো ভালো হয়, যদি কলকাতা থেকেই জিপে আসেন। রাতটা আচার্যির অতিথিশালায় থেকে ভোরে বেড়িয়ে পড়ুন। এখানের সবকছুির নামই কাঁকড়াঝোড়। গাঁয়ের নাম ওই, জঙ্গলের নামও ওই কাঁকড়াঝোড়। দেখেশুনে, সেই 'তকাই'-এর গল্প মনে

পড়ছে। যার নিজের নাম তকাই, বাবার নাম তকাই, মার নাম তকাই। সবার নামই তকাই।

আমরা এক তকাই-কাঁকড়াঝোড় আজব দেশে এসে পৌঁছুলাম।

বাংলোটার পাশ দিয়ে টিলার ঢালে নেমে এসে দাঁড়ালাম যেখানে পুকুরের পাশে—সে একটা বিশাল আমগাছ। তমালের মতো পাতা, আমের মতো নয়, অথচ আম, বুনো আম··গাঁয়ের ছেলেরা বললো। প্রচুর আম হয়। এখন গাছতলায় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে গরুর গাড়ি। গরু চরছে মাঠে। মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে আগের সপ্তাহে।

ছোট এই চাষী পাড়া বেড় দিয়ে মাটিবালির পথ গেছে। আমরা সেই পথে। বাঁহাতি ঝকঝকে বাড়িঘর দুয়োর। দেয়ালে আলপনা। দোরগোড়ায় ছাপছোপ। এক ধরনের গাছের আঠা পিটুলিগোলা জলের মতন। সেই আঠা ছিটিয়ে ছিটিয়ে সুন্দর সহজ সব কল্কা উঠোন পর্যন্ত ছুটে চলে গেছে। নবান্ন শেষ। তুলসীমঞ্চের মতন ঢিপি তৈরি উঠানের একপাশে। সেখানে মাটির পিদ্দিম। ঠাকুর-ঠুকুর বলতে ওই। নতুন কাপড় গা থেকে এখনো খোলেনি কেউ। ময়লা এখানে কম হয়। কোরা কাপড় ধুলেও দাগ উঠতে মাস দুই।

যেদিকে চোখ পড়ে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। ক্ষেতে বেগুন মুলো রাঙা আলু থেকে শুরু করে, মাচায় শিম, বরবটি, ধুঁধুল থই থই করছে। ডাকাতে শিম, ডাকাতে বরবটি। বরবটি একটা হাতে ছিঁড়ে মেপে দেখি প্রায় দুহাত। ভিতরে নধর কলাই—পেট ভর্তি মাংস। ধুঁধুল চাষ করতে হয় না। বুনো ধুঁধুল মুক্তকেশী বেগুন ফলেছে প্রায় সব ক্ষেতেই। ফুলকপি বাঁধাকপি আছে, পালং নটে আছে, লাউ চালকুমড়ো প্রতি চালে। অড়রের ডাল করেছে। সর্ষে পিঁয়াজ আদা, কী নেই? মেটে কুমড়ো লাগিয়ে দিয়েছে বেগুন

ক্ষেতে। রেড়ির গাছ খাড়া হয়ে উঠেছে। ঢেঁড়শ ইয়া লম্বাপানা। অর্থাৎ গাছপালা, ফসলে মাঠ থই থই। গর্তপানা পুকুর ভর্তি মাছ। ডালপালা ফেলে রেখেছে, যাতে চুরি না যায়। পুকুর সবার নেই। গোটা পাড়ায় শুধু দুটোই পুকুর। তার দরকারও নেই। জলের জন্যে ঝোরা আছে। ঝোরার জলেই চান খাওয়া কাচাকাচি, ক্ষেতে জল দেওয়া, সবকিছুই চলে। ক্ষেত গাঁয়ের দরজা থেকে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত চলে গেছে লম্বালম্বি।

বড়ো গাছ বলতে কাঞ্চন। সেই কাঞ্চনের পাতাও ভাজা খাওয়া চলে। আরেক ধরনের লতা দেখলাম। ওরা বললো, খাম্বালু। শিকড়ের কাছে খাম্বার মতন লম্বাচওড়া বিশালকার আলু। আমাদের আলুর বদলি হিসেবে চাষ করে। কখনো বন খুঁড়ে নিয়ে আসে, ওদের মধ্যে গরিব যারা।

হাঁস মুরগি ছাগল গরু ফি ঘরেই। সে-মুরগি লড়ায়ে—মুরগির মতন পালোয়ান সব। মোগরগুলো তেড়ে এলে, সমীহ করে দুপা পিছোতেই হয়।

মুগ্ধ বিমূঢ় চোখে এইসব চতুর্দিক দেখতে দেখতে এক চাষী-বাড়িতে ঢুকে পড়ি। দরজার পাশে পৈটেয় বসে ছিল অনন্ত মুণ্ডা। কাপড়ের খুঁট পিঠ পেঁচিয়ে বুকের কাছে। শান্ত ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি। ক্ষেতের পানে তাকিয়ে বসেছিল। আমাদের দাঁড়াতে দেখে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

জল চাই। জল খাওয়াবে একটু?

ভিতরে নিয়ে গেলো অনন্ত। আমরা ওর মাটির তকতকে বারান্দায় জুবড়ে বসলাম। বাড়ির মেয়েরা খাটিয়ায় বসে চুল বাঁধছিল। আমরা হঠাৎ যাওয়ায় বিস্ময় আছে, অকারণ লজ্জা পেয়ে উঠে যাওয়া নেই। বাংলায় কথা বলে। একটু অন্য ধরনের বাংলা। বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বাবুই-ঘাস বুনেছে একটা ক্ষেতে। খুব দামি ঘাস। ইংরিজি নাম 'স্যাভয়'। বললাম এ-ঘাস দিয়ে কী করো?

দড়ি। খাটিয়ার দড়ি। যত বাঁধা-ছাঁদার কাজে লাগে, হরেক কাজে লাগে।

মনে পড়লো, ঝাড়গ্রামের কাছে একটা কাগজকল হয়েছে সম্প্রতি। আরো একটা হবার কথা আছে, এই জেলাতেই। বাবুই-ঘাসের চাষ বাড়লে খুব দামী কাগজ পাওয়া যেতে পারতো। চাষীরাও দাম পেতো। ওদের ঘাস এতোই কম যে নিজেদের কাজে লাগে। চাষে কোন কষ্ট নেই। ঘাস থেকেই বীজ পেয়ে যায়।

সামনের ওই পাহাড়টার ওপারেই বিহারের গন্দনিয়া গ্রাম। হাট বসে হপ্তায় দুবার। কাঁকড়াঝোড়ের এই ফসল সব ওই গন্দনিয়ার হাটে যায়। এখান থেকে দু কোশ পথ—এই একটুকুন। বেলপাহাড়ি তো ছ কোশ।

দাম কেমন মেলে?

ভালোই। বেগুন দেড় টাকা কিলো। নধর বেগুন। দেখলুম। কলকাতায় অবশ্য ওই বেগুন আড়াই-তিন। অনন্তর উঠোনের একটা দিকে ঢেঁকিঘর অন্যদিকে গোয়াল। জাল শুকোচ্ছে চালের মাথায়। কাঁসার চিকণ ঘটিতে জল এলো পাতার ওপর ক'ডেলা গুড়।

যদি আসি, তোমার বাড়িতে থাকতে দেবে?

কেনে? বাংলো তো কাছেই বাবু। বাংলোতে উঠবেন। সব বাবু তো ওখানেই ওটেন।

আমরা বাবু নই।

অনন্ত হাসে। সবাই ওকথা বলে—আসবেন তো?

নিশ্চয় আসবো। সবুজ স্বর্গরাজ্যে [illegible] -বা কোন রাসায়নিক সার লাগায় না। ওদের সেই পুরনো ব্যবস্থা, গোবর মাটি পচানি

খড়—এইসব। এই সব দিয়ে জমিতে হীরে ফলিয়েছে। জমিতে ক্ষেতি হচ্ছে আট থেকে দশ বছর—একতোড়ে। অনন্তদের মুখে-চোখে সীমাবদ্ধ পাহাড়ের শান্তি, সুস্থ ভয়। বেশি ওরা চায় না। চেয়েও পাবে না জানে। কবে কতদিন আগে ওর বাপ ঠাকুদ্দারা কোন আপন আদিবাসী পাড়া থেকে উঠে এসেছিল, সে খবরে ওদের দরকার নেই। এখানে মুনডা আছে মাহাতো আছে। সব মিলিয়ে বারো-চোদ্দ ঘর। গাঁয়ের মাঝে বটগাছে লটকানো আছে একটা লালরঙের পোস্টবাক্স। শহরের সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ—এইভাবে।

টিলা পেরিয়ে, বাঁহাতে বাংলো রেখে গরুর গাড়ির মতন গাঁয়ে নেমে এসেছি। দূর থেকে এই গাঁ-র টান জবরদস্ত। তার কাছে নতিস্বীকার না করে আমার উপায় নেই।

বিকেল প্রায় ফুরোতে বসেছে। গাঁয়ে চক্কর মেরে উঠে আসবো বলেই, এই নামা। নামি, উঠতে দেরি হবে না। চৌকিদারকে খত্ দেখিয়ে দরজা খুলে ঝাঁটপাট লাগাতে বলে এসেছি। টয়লেটের বালতিগুলো ভরাট করতে বলে এসেছি। মুরগি রাতে চলবে—এমন একটা আশা প্রকাশ করে এসেছি। আর কী চাই?

কাঁকরাঝোড় জঙ্গলে

কাঁকর আর ঝোরা—এই দুটো মিলে কাঁকরাঝোড়। মেদিনীপুরের শেষ সীমায়, টাটা পাহাড়ের কোলে। গভীর জঙ্গল শাল-শিমুল আসন সেগুন অর্জুনের। গ্রামের নাম কাঁকড়াঝোড়। বেলপাহাড়ি থেকে সোজা পীচপথে বাঁশপাহাড়ি। মাইল পনেরো-ষোলো। তার মাঝামাঝি বাঁহাতি পথ জঙ্গলে ঢোকার। মরাম-কাটা পথ উঁচুনিচু। সেই পথ ধরে মাইল দশেক ভিতরে গেলে পর বাংলো। টিলার মাথা কেটে বসানো কাচঘর। সামনে ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি। একপাশে নেবুঘাসের জঙ্গল। চাষ করা হয়েছে। জঙ্গলে কফি চাষ হচ্ছে। আঙুর কমলা পরীক্ষামূলকভাবে ফলানো হচ্ছে। কাজু হচ্ছে। স্যাভয় ঘাস গজাচ্ছে দড়ি-দড়ার জন্যে। কাগজ কলের জন্য। ঝাড়গ্রামে কাগজকল তৈরি হয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় আরো একটা কল হবে, শুনে এলাম।

ঝাড়গ্রামে অনেকবার গিয়েছি। সেখান থেকে বেলপাহাড়ি। বেলপাহাড়ি বনবাংলোয় থেকেছি। সুন্দর বাংলো। লাগানো গাছ-পালার ভিতরে তিনঘর, সামনে বারান্দা, বারান্দায় ক্যাকটাসের টব। বারান্দার নিচে ঘাসের বিছানা। এদিক-ওদিক ফুলের গোছ। যে কোন ট্রেনে ঝাড়গ্রাম। সেখানে পছন্দসই খাবারের আর মাথাগোঁজার জন্যে বিনোদ আচার্যির দরবার। শান্তিনিকেতন বোর্ডিং। আমাদের বিনোদদা পুরনো আটচালার পাশে নতুন হোটেল বানিয়ে দিয়েছেন। তিনতলা বাড়ি। ঝকঝকে ঘর স্নানঘর বিছানা বালিশ। বাংলো-কানা-করে-দেওয়া আতিথেয়তা। কী চাই? কোন মাছের কোন প্রিপারেশন দরকার, মুখ ফুটে বললেই বিনোদদা তৈরি। কলকাতা থেকে একটা চিঠি ছাড়ুন। তারপর

বেরিয়ে পড়ুন। ঝাড়গ্রামে থানার পেছনেই ঘোড়াধরা বাংলো। বনবাংলো ইস্টিশনের কাছে। ডি এফ ও ঝাড়গ্রামকে লিখে দেখতে পারেন।

এখন শালের জঙ্গলের নিচে জড়ো হয়ে আছে শুকনো পাতা। মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। ভোরবেলায় একটু শীত। সন্ধে থেকে মধ্যরাত চমৎকার। টের পাচ্ছি শিমুল মাদারের রক্তপাত বন্ধ হয়ে আসছে। পাতার আকুলি-বিকুলি। এদিকে পলাশ—পলাশই সব। বেলপাহাড়ি যাবার রাস্তার দুধার পুড়িয়ে খেয়ে এখন চুপচাপ। এদিক পানে ক্ষেতখামারের বেড়া রাঙিয়ে রাখে তেপলতে। এদিক-কার সবই অন্যরকম। জঙ্গলের ভেতর মুখ গুঁজে ঘরবাড়ি। উধাও রাস্তা। কেচেন্দা বাঁধের দিকে যাওয়া যায়। যাওয়া যায় রাজ-বাড়ির দিকটায়। সেবায়তনের দিকে কিংবা, ঠিকঠাক কিছু না ভেবে রাস্তায় গড়ানো। গড়ানো কথাটা ভেবেচিন্তেই বসালাম। এতো পরিচ্ছন্ন, কাদাহীন রাঙা ধুলো-মাখা পথ-ঘাট আর বুঝি কোথাও নেই; শুকো খরা ভাব বুকের দুটো পাল্লা খুলে দেয় এখানে। লোকে যে কেন ঘাটশিলা-শিমুলতলা করে, তা আমি বুঝে পাই না। তা বলে শহুরে ভাব কি নেই? আছে। কিন্তু, সে-ভাব বাজারের বেড়া ডিঙিয়ে ইতিউতি পাক খায় না। শহরের সুবিধেটুকুন পুরোপুরি নিয়ে স্বার্থপর দৈত্যের মতো সুখভোগ করার জন্যে, আমি তো বছরে বারকয়েক ছুটি। ছুট কি আর শেষ হয়? ছুট শুরু ঝাড়গ্রামে, দৌড় বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি, কাঁকো—বীনপুর, শিলদা পেরিয়ে পেরিয়ে ধানক্ষেত, জনবসতি।

বেলপাহাড়ির পথে একটা জায়গায় আপনি থমকে দাঁড়াবেনই। চোখের সামনে খুলে উঠবে টানা ভুরুর মতন জঙ্গলের দাগ। শালচারা লাগানো হয়েছে। শৈশবে কেমন স্থির থাকে এবং এই পড়ন্ত বিকেলে। সামনে হাটখোলা খেলার মাঠ। তাহলেও?

ঐ জঙ্গলের শুরু। ওখান থেকেই। ছোট-বড়-মাঝারি গাছের

জঙ্গলে চোখ আটকে যায়। বনমুরগি এপাশ থেকে ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁপরূপ বর্ণনার বাইরে। বাঁদিকে দূরে সেই বিখ্যাত টেরেন। জঙ্গল আর পাহাড়। আস্তে আস্তে উঁচুতে উঠছি আমরা। কাঁকরাঝোড় তো খোদ পাহাড়। বেল-পাহাড়ি তার উপর হলেও সমুদ্দুর পিঠ থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে।

তবে গাড়ি একটা দরকারই। জিপ গাড়ি। কাঁকড়াঝোড় যেতে দুটো টারনিং পয়েনট আছে, যা জিপ ছাড়া আর কিছুর পক্ষে এঁটে ওঠা শক্ত। কলকাতা থেকে সোজা না পেলে, ঝাড়গ্রাম থেকে চেষ্টা করতে হবে। বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি পর্যন্ত তো বাসেই স্বর্গে পৌঁছুবেন। তৃতীয় স্বর্গ, এই কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে, তার বাংলোয় যেতে জিপ গাড়ি দরকার এবং দরকার আগাম যোগাযোগ ডি এফ ও ঝাড়গ্রামের সঙ্গে। তিনি অনুমতি না দিলে বাংলোয় ঢুকতে পারবেন না!

গত বছর দোলের সময়টা ঝাড়গ্রামে কেটেছে। তার আগে সিমলিপাল জঙ্গল এক রকম ঘোরের মতন। আবার তারই মধ্যে বিখ্যাত খৈরীর সঙ্গে মোলাকাত। খৈরীর সঙ্গে পুরনো আলাপ আমার। বন্ধুদের সঙ্গে এই প্রথম। জশীপুরে থেকেই চৌধুরী সাহেব আমাদের জঙ্গলে যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এবং সেদিন রাতেই। আমরা আমাদের অ্যামবাসাডর রেখে ওঁর জিপে চাহালা, নোয়ানা, বরেহিপানির বাংলো থেকে বাংলোয় দৌড়ে বেড়ালাম দুদিন। কিন্তু সে অন্য গল্প। গত বছরের। এ বছর কাঁকড়াঝোড়ই মাথায় থাক। সিমলিপালের তুলনায় সে হলো ধানদুব্বো। তাই সই। দুর্গা সাউ কাঠের ব্যাপারী। ধরে পড়লাম, গাড়ি বের করো। জঙ্গলে যাব। কাজে-কাজেই তো জীবনটা কাটালে। এবার দুদিনের অকাজ। নিলেমে জঙ্গল কিনে নেয় এই দুর্গাদারা। জঙ্গলে এমন সঙ্গীরই দরকার। সঙ্গে আমার বন্ধু

ডঃ শম্ভুলাল বসাক। গাছপালার ডাক্তার। জংলা পাট-বীজ খুঁজতে যাচ্ছে—আদিবাসি মহল্লায়।

ভোরে বেরিয়ে শিলদায় মাছ-ভাত। বেলপাহাড়ি টপকে গাড়ি ছুটছে কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলের দিকে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে এই জঙ্গল কেবল ফসকে যাচ্ছে। আজ বাগে পেয়েছি। শেষ দেখে ছাড়বো। ঠিক ছুকুর গড়িয়ে বিকেলের মুখটায়। আলো পশ্চিম থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে পথের ওপর। একটা গন্ধ পাচ্ছি। নাকের পাটা ফুলিয়ে ধরার চেষ্টায় ফল হচ্ছে না। বনগন্ধ বড়ো পাঁচমিশেলি। জঙ্গল তো আর একা কাউকে নিয়ে নয়।

জঙ্গল বেশ গভীর। হাতি ভাল্লুক আর লেপর্ড খুবই মেলে লোকে বলেছে। একটা সময় প্রচুর জন্তু-জানোয়ার দেখা যেতো। সেজন্যে 'ওয়াচ টাওয়ার' তৈরি। আমরা ওয়াচ টাওয়ার কাটিয়ে বাংলোর দিকে। পথে মুরগি পড়েছে আকছারই। বুনো শুয়োর ক্ষুরে মাটি ঘেঁটেছে বেশ ক জায়গায়। এখন ঠিক জন্তু-জানোয়ার বের হবার সময় নয়।

কোথা থেকে জল পড়ার শব্দ কানে আসছে। ঝর্ণা-কছমের জিনিসে ছেয়ে আছে এই পাহাড় জঙ্গল। এঁকেবেঁকে আমাদের জিপ এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। কোথাও বন পাতলা হয়ে আসছে। কোথাও জমজমাট। ভেতরে চোখ চলছে না। পথে গাড়ির চাকার দাগ বিস্তর। ডানহাতি বাঁহাতি ট্রাক যাবার নিজস্ব পথ বানানো হয়েছে। একদিকে মাকড়ভুলা, কদমডিহা। রাস্তা সামনে ছভাগ হয়ে গেছে। ফলকে লেখা পড়ে জানা গেলো, বাঁহাতি পথ তামা তোলার জায়গায় নিয়ে যাবে। কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রসপেকটিং চলছে। বছর আড়াই হলো ক্যাম্প ফেলে ভূবিজ্ঞানীর দল এই জঙ্গলের একটেরে পড়ে। কাল দেখা যাবে। আজ সোজা বাংলো।

বিকেল হয়ে আসছে সেই সঙ্গে কেমন একটা ছমছমানির ভাব।

সর্বত্র। গাছের পাতাপুতাও নড়ছে না। গন্ধ থমকে আছে ধোঁয়ার মতন। পাঁচমিশেলি গন্ধ। শালের রস ছাড়া তামা হতেই পারে না। সেই রসেই ধুনো। লোধারা গাছ চেঁছে সেই ধুনো চুরি করে বাজারে বেচে। কেঁদু পাতা তো আছেই। কেঁদু পাতার রং ঘন সবুজ, কালোর থেকে এগিয়ে। কেঁদুই আবলুস।

চাষবাস পুরোদমে চলছে। চন্দন চাষ হচ্ছে গুটিপোকার চাষ হচ্ছে। কফি আঙুর সরবতী লেবু চাষ নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে জোরদার। বনবিভাগই করছে। সিট্রোনেলা বা নেবু ঘাসের চাষ সর্বত্র। এই ঘাসকে স্থানীয় সবাই 'ধন্বন্তরী' হিসেবে মানে। কাটা-ছেঁড়া পোড়া ঘায়ে টিপে রসটুকু লাগিয়ে দিলেই, ব্যস। এই ঘাসের চাষ চা-বাগান অঞ্চলে প্রচুর দেখেছি। পড়ো পতিত বাগানগুলোয় ঢালাও চাষ হচ্ছে! এই ঘাসের নির্যাস সিরাপ, ওষুধ প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে। বিদেশে রফতানিও হয়।

ধান ভানতে শিবের গীত দ্রুত শেষ করা দরকার। সন্ধের মুখে বাংলোয় পৌঁছুলাম। রাত হতে বাকি। 'ওয়াচ টাওয়ার' টানছে ক্রমাগত। বেশি রাতের আগেই ওখানে পৌঁছুনো দরকার। আকাশে চাঁদ জ্বলছে। আমাদের আলো দেখিয়ে কালোর কাছে নিয়ে যাবে। কালো মানে জীবজন্তু। কালো মানে হিংস্রতা। মানুষ দেখলে ওরা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখ খুলে দাঁড়ালাম। চোখ তো নয়, খুরপির মতন চক্কর দিয়ে ঘুরছে, কুপিয়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিক। যাকে দেখতে চাই, সে কোথায়? কোনদিকে?

চলো দিল্লি

আজ থেকে বছর পনেরো ষোলো আগে সর্বপ্রথম দিল্লি যাই। না, কোনো কাজেকর্মে নয়। এমনিই বেড়াতে। তখন আমি দড়িছেঁড়া গরু। কাজ ধরি আর কাজ ছাড়ি। পাকাপাকিভাবে ঘর গেরস্থলি বুকে চেপে ঠেসে বসেনি। তাই বিটু যখন বললো, আমি যাচ্ছি তুমি যাবে নাকি? একটু দিল্লি ঘুরে আসি। কোনো খরচ খরচা নেই। একপিঠের গাড়িভাড়া যোগাড় করতে পারলে ভালো। না পারলে কুছ পরোয়া নেই। ফাস্ট ক্লাসের ভাড়া পাবো—তাবে দুজনের অনায়াসেই হয়ে যাবে।

ওর ইনটারভিউ আছে। পি এইচ ডি করে এসেছে—ঐ দিল্লি থেকেই। পুনায় এখনো ওর বন্ধুবান্ধব বহুৎ আছে। কটা দিন ঝমঝমিয়ে চলে যাবে আঁচ করে 'ঠিক হ্যায়' বলে দিলুম।

বিটু মানে আমার ছোটবেলার ইস্কুল বয়েসের বন্ধু। কৃষি-বিশেষজ্ঞ। গাছপালা নিয়ে ওর আমার দুজনের কারবার। তবে দুরকমের। তাতে কিছু এসে যায় না। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভিতরের ব্যাপার একটা। দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকলেও, আছে। থাকে।

ফলে, একদিন ভেসে পড়লাম। কলকাতার শীত যাই-যাই করেও যায়নি। সুতরাং দিল্লির ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করা যায়। কাপ-কাটা শীত। শীতবস্ত্র বলতে আমার হাতকাটা সোয়েটার সম্বল। কে যেন পুরো হাতের সোয়েটার একটা ধার দিল। বিটু বললো, আরে ওখানে চলো না। ওদের অনেক আছে। যার হোক একটা গায়ে চড়িয়ে নেওয়া যাবে। ওর

একটা ট্যুইডের কোট আছে। দিললি থাকবার সময় কোন এক সুদিনে বানানো। সেইটা আর দু তিন খানা প্যাণ্টুলুন। আমারও কিছুকিছু। এই নিয়ে দিললি-জয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আজ অমন এলোমেলো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটায় কেমন ধারা চাপ তৈরি হয়। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ফিরে ফিরে, ভাবার চেষ্টা করি, সত্যই কি ওভাবে গিয়েছিলাম? যাওয়া যায়? এখন ভাবতে পারি না। কাজ ছাড়া অকাজে আলস্যবিলাসে দিললি ঘুরে আসার কথা কল্পনাও মানে না।

অথচ গিয়েছিলাম তো। প্রায় সপ্তা দুই ছিলামও। আস্তানা পুনা ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাস। দুটো চৌকি জুড়ে তিনজনের শোওয়া বসা করা। তিনজন, না চারজন? বোধ করি চারজনই, দুজনের ঘর—আমরা দুই বাড়তি। বিজু আর আলির ঘর। নাকি বিজু, মানে বিচিত্রর একলার? তবে ঘর যারই থাকুক, আমরা পাঁচ ছ'জন উল্লুক একটা ঘরেই গুলতানি মারতাম। রাত একটা-দুটো আকছারই হতো। ওরা পালা করে একদিন করে সঙ্গ দিতো আমার। সেদিন তার ডিপার্টমেনটে যাওয়া হতো না। বা, গিয়ে ঝাঁকিদর্শন দিয়েই পালাতো।

আমরা পুষার ঐ হসটেলে শিকড় বসিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার পেতে ফেললাম।

বিশাল ক্যামপাস। গাছপালা থই থই করছে চারদিক। দুদিকে আসা-যাওয়ার চওড়া পীচের রাস্তা। নানা বিভাগীয় আপিস, প্রসাসন-বাড়ি, স্টাফ কোয়াটার, অধ্যাপক-আবাস, হরেক হস্টেল—কী নেই। সমস্তই ঐ বিশাল ক্যামপাসের ভিতর। আমাদের হসটেলটার নাম পোসট গ্রাজুয়েট হস্টেল। সবাই ডাক্তার হবার তালিম নিচ্ছে। বিটু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তুষার হয়েছে। সোমনাথ, বিজু, আলি—সবাই। আমি কমপাউনডার। হসটেলটা বোধ করি তিনতলাই হবে। শত শত ঘর। লম্বা

বারান্দা। উধাও ছাদ। বাঁধের মতন আলসে। সামনে বোগেন ভিলা আর চেরিফুলের গাছ। রঙিন চেরিফুল ডালপালা ছেয়ে ফেলেছে। পাতা শূন্য ঐ গাছগুলো ঘিরে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে কালো ভোমরা আর হলদেটে মৌমাছির ঝাঁক। ঝিঁকি পোকা আর বোলতার গুলতানি সর্বত্র।

বেশ ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা জব্দ করার জন্য মাথা পাকিয়ে মাফলার আর জোব্বার মতন তুঁষের চাদর। কার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আজ আর মনে নেই।

আগে থেকে খবর দেওয়াই ছিলো। স্টেশনে হাজির বিজু আর আলী। তুষারের, কাজ পড়ে গেছে, 'আসতে পারেনি। হাতচিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে—আমি আজ সন্ধের ব্যাপারটার দায়িত্ব নিচ্ছি। বিজুদার ঘরে হবে। আমার রুমমেট সুবিধের নয়।

প্ল্যাটফর্মে নামতে-না নামতেই এই সুখবর। সবাই লম্বা লম্বা পা ফেলে স্টেশন থেকে বেরুবার দরজার দিকে। স্কুটারের সারির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইরের একবারে অন্যপ্রান্তে পুষা। বেশ ক মাইল হবে। তাছাড়া ক্যামপাসের গেট থেকে হস্টেলটাও দূর আছে। ওরা সাইকেলে যাতায়াত করে। আমি আবার ও জিনিসটায় কখনো বিশ্বাস করিনি। শিখতে পারিনি। সুতরাং টের পেলাম, ওদের কপালে দুঃখ আছে। আমাকে পেছনে বসিয়ে আসা যাওয়া করতে হবে। গেট পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। তারপর, তো দিল্লি দেখা।

আমরা সন্ধের অপেক্ষায় মনে মনে মশগুল হয়ে উঠি। বিটুর ব্যাগেও একটা আছে। কলকাতার মাল। সুতরাং, সুরুটা বেশ জমিয়েই হবে আন্দাজ করা যাচ্ছে। শুরু ভালোয়-ভালোয় হলে, শেষটা কোনো ভাবনাই থাকে না।

হাতমুখে জল লাগিয়ে হস্টেল থেকে বেরুলাম। চা জল-খাবারের জন্যে পাশের বাড়ি যেতে হবে। ওখানেই পাকশালা।

দুবেলা খাবারের জন্যেও তাই। এইটাই একটু ঝঞ্ঝাটের মতন। তা, কী করা? যেখানে যা নিয়ম! আর এক মুশকিলে পড়লাম প্রায় যাওয়ামাত্রই। পরোটা ভেজে এলো। মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে আনলুম। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো। কী ব্যাপার?

—ভুল করে নারকোল তেল ফেলে দিয়েছে নাকি হে? বিচ্ছিরি…

ভুল নয়, এই খেতে হবে। কেরালার ছেলেদের সঙ্গে আমাদের এই কিচেন। অন্যেরা তো মাছ ছোঁবে না। তাই মাছের লোভে নারকোল তেল গিলে মরছি। তবে খাঁটি। এক-আধ বেলাই অসুবিধে হবে। তারপর ঠিক অব্যেশ হয়ে যাবে। খেয়ে ফ্যালো। নাক টিপে খাও। সেই কাল সন্ধেয় কখন কী খেয়েছো!

যমুনা ব্রিজের কাছে আমাদের গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওই প্রথম যমুনা-দর্শণ। কিন্তু যমুনা কোথায়? দিগন্ত-ছোঁয়া বালির চড়া আর তার মধ্যে তরমুজলতা। এক একটা মাথা জুড়ে ঝাঁপিতে সাপের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে তরমুজের লতা। ফনফনিয়ে বাড়বে। একটু হাওয়ার ছিটে, একটু বালির আর ভিতরে আদর-সোহাগ যমুনার কালো জলের তো আছেই। আর কী চাই। গোটা দিললির চাষীর মুখে হাসি। সুন্দর বনের তরমুজের মতন ছোট নয়, ঢাউস ভূমণ্ডলের মতন বিশাল আর অন্তররাঙা।

গাছপালার মধ্যে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। গমের নানান ভ্যারাইটি—উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হয়েছে। আছে নানারকম অর্চারীও। ফুলের গাছ। রকমারি ফুলের চাষ করা হয়েছে। ম্যয় গাঁজা ডিভিশন পর্যন্ত। তাতে ফুল এসেছে। পাতাগুলো চেরা চেরা। অনেকটা ঢেঁড়স জাতের গাছ। ফুল শুকোলে, ফুলের কাছ বরাবর কিছু পাতা ও বীজ ছিঁড়ে পকেট ভর্তি করলাম। ঘরে ফিরে সেগুলো দুটো ভারি ট্রাংকের মাঝখানে রেখে চেপে-পিষে

ফেলা হলো। তারপর বেকিং পর্ব অর্থাৎ শুকিয়ে নেবার পালা। রোদ্দুরে তো আর ঢেলে শুকোবার উপায় নেই। হসটেল, প্রচুর ছেলেপুলে। তারা দেখলে কী ভাববে? সুতরাং, টেবিল ল্যামপের গোল শেড উলটো করে দিয়ে তাতেই ক ঘণ্টা রাখা। ডুমের আলোর জোরে সেগুলো আধশুকনো! কলকে কোথায় পাওয়া যাবে? চারমিনারের তামাক বের করে, পাতা মিশিয়ে, সিগারেট খোল খানিকটা খালি করে, তার ভেতর ধীরে-যত্নে পোরা। তারপর কাঠি ধরানো। তিনটানে পুড়ে ছাই। আমাদের লোকসংখ্যা তো বড়ো কম না? সুতরাং, শ্রমমূলক এই নেশাভাঙ করতে বহুৎ রাত কেটে যেতো। মাঝখানে ইনটারভ্যাল মতন, ঘর থেকে বেরিয়ে আসা। তারপর আবার টাটে বসা। এইভাবে দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিলো।

কোনো কোনদিন আলি তার ল্যাবোরেটরি থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে রেকটিফায়েড স্পিরিট নিয়ে আসতো। ইথাইল এ্যালকো-কোহলকে রি-ডিসটিল করে নির্ভাবনাময় সেই মদ্য পরিবেশিত হতো পাতে পাতে। সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে জল আর মিঠে পানি। নয়তো খাওয়া অসম্ভব। কেউ বলতো, প্রসেস করা নেই বলে খেয়ে মজা নেই। কিন্তু, আমরা তো আর মজা মারতে বসিনি? গরিবের ঘোড়ারোগ হলে যে কোনো ওষুধই ওষুধ! দিন একরকম ভাবে কেটে যাচ্ছিলো।

কে যেন বললো, কী রে দিলজি এলি, ঘরের মধ্যেই জমে থাকবি নাকি? একটু ঘুরে-ঘারে দেখ?

গেলেই হয়।

ঠিক হলো, কাল 'বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক দেখতে যাওয়া হবে। সারাটা দিন ওখানে কাটিয়ে সন্ধের ফেরা। টিফিন বাক্সে দুপুরের খাবার গুছিয়ে নেওয়া। এছাড়াও যদি কিছু লাগে ওখানে কেনা যাবে। কিছু ফলমূল। ওয়াটার-বটলে জল।

বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে বাচ্চাকাচ্চা বাড়ির সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যায়। শীতের দিনে ঘুরে ঘুরে, কখনো বসে, আড্ডা মেরে, দিনটা কাটানো। ছুটি-ছাটার দিনে অতোবড়ো পার্ক উপচে পড়ে ভিড়ে।

আমাদের পূষা থেকে বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক বেশি দূর নয়। কলকাতার যেমন হর্টিকালচার গারডেন বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক তেমনিই একটি পার্ক। তবে অনেক বেশি সাজানো গোছানো। অনেক বেশি সুন্দর। উঁচুনীচু টিলা মাঠ জমি নিচু জায়গা সবকিছুকে ঠিকঠাক ব্যবহার করা হয়েছে। কারোর ছাড়ান ছোড়ন নেই। উপরে ফুল, নিচেয় ফুল, মাঝে ঝুলে-থাকা ফুল-বাগিচা আর তার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রঙিন ফোয়ারা। নানা রঙের ছাতা। তার নীচে মানুষ। আলস্য-বিলাসে একটা দিন ফুরোতে এসেছে। সাঁতারের পুল আছে। সেখানে আলাদা পয়সা দিয়ে সাঁতারে নামে ছেলেমেয়ের দল। ঘণ্টা পিছু জলবিহার। রেস্টুরেন্ট আছে। একটা দিনের জন্য যা কিছু উপভোগ্য সব মিলবে বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে।

আমাদের মত আধাবৃদ্ধেরও একটা দিন কেটে গেলো সহজে, অনায়াসে। একটু বিকেল-বিকেল বেরিয়ে পড়লাম। করলবাগে যাবো। সেখানে বটুকদা থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। দীর্ঘকাল দেখা নেই। ডি. কে অর্থাৎ সিগনেট প্রেসের সেই দিলীপ কুমার গুপ্তের বাড়িতে 'হরবোলায়' বটুকদা আমাদের গাধা-গলায় গানের ঘণ্টা বাঁধার চেষ্টা করতেন। বটুকদা কবি। বটুকদা নাট্যকার। বটুকদা আমাদের চিরদিনের ভালোবাসার মানুষ। সেই তিনি আমাদের ছেড়ে বহুকাল দিললিতে। তাঁর সঙ্গে 'দেখা না করে, একবার প্রণাম না করে কীভাবে দিললি ছেড়ে যাবো? পাপ হবে না? তাছাড়া, 'কুয়োতলা' বলে একটা বই আমার বেরিয়েছে, কিছুদিন হলো। যেটা, ইচ্ছে, বটুকদাকে দিই। ওটা আর একটা পত্তর বই।

ছুটো বই বগলদাবা করে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বটুকদার বাড়ির

বেশি ভিড় হয় দশাশ্বমেধ ঘাটে। তারপরই ভিড়ের ব্যাপারে এই ঘাট। । ঘাটের উপরে কেদারেশ্বর শিবের মন্দির।

চৌষট্টি ঘাট ॥ ঘাটের চূড়ায় চৌদ্দটি দেবীর মন্দির। হিন্দু রমনীদের খুব ভিড় হয় এখানে। বাংলাদেশের ষষ্টি দেবীর পুজো এখনো হয়।

দশাশ্বমেধ ঘাট ॥ ঘাটমালার কেন্দ্রে এই ঘাটের অবস্থান। কাশীনরেশ দিবোদাস এই ঘাটটি তৈরি করান। পঞ্চতীর্থের দ্বিতীয় এই তীর্থ সম্পর্কে বলা হয়, দিবোদাস এখানে ভগবান ও ব্রহ্মাকে তুষ্ট করার জন্যে পর পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কথিত আছে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। শীতলা মন্দিরও ঘাটসংলগ্ন।

অহল্যাবাঈ ঘাট ॥ দশাশ্বমেধ ঘাটসংলগ্ন এই ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন হোলকার মহারাণী অহল্যাবাঈ।

মানমন্দির ঘাট ॥ জয়পুরের রাজা মানসিংহ ঘাটটি তৈরি করেন। ঘাটসংলগ্ন প্রাসাদটি ১৬০০ খৃঃ তৈরি। অট্টালিকার বারান্দা অর্ধচন্দ্রকার। জয়পুরের বিখ্যাত জ্যোতিষী রাজা সোয়াই জয়সিংহ প্রাসাদটি মানমন্দির হিসাবে ব্যবহার করতেন বলে ঘাটের নাম মানমন্দির ঘাট।

নেপালী ঘাট ॥ প্যাগোডার মতো দেখতে কাঠের সুন্দর একটি প্রাসাদ ঘাটের উপরে। নেপালের রাজপরিবার তৈরি করেছিলেন। নপাল সরকার এখনো এর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এটির সাধারণ াাম 'নেপাল হাউজ'।

মনিকর্ণিকা ঘাট ॥ দশাশ্বমেধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মণিকর্ণিকা। শানা কথা, এই ঘাট দু হাজার বছরের পুরনো। শিবের রত্নখচিত র্ণকুণ্ডল এখানে পড়েছিল। শ্মশান বিশেষ।

সিন্ধিয়া ঘাট। গোয়ালিয়রের রানী বিজাবাই সিন্ধিয়া এটি

তৈরী করেন। ভূমিকম্পে এই ঘাটটির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। পরে আবার নতুন করে তৈরী করা হয়েছে।

পঞ্চগঙ্গা ঘাট॥ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘাট। পঞ্চতীর্থের এক তীর্থ। প্রবাদ বলে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কিরণ আর ধূপ এই ঘাটের কাছে এসে মিশেছে। এখানেই সেই বিখ্যাত বেনীমাধব ধ্বজা। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর দেখাশোনা করেন। এখনকার মন্দিরে উঠে কাশী, রামগড় আর গঙ্গার দৃশ্য দেখা যায় এছাড়া, অন্যান্য ঘাটের মধ্যে আছে বরুণা সঙ্গম ঘাট, জৈন ঘাট, লাল ঘাট, গাই ঘাট, রাজঘাট, সঙ্কাত ঘাট, ভোঁসল ঘাট, আনন্দময়ী ঘাট প্রভৃতি প্রধান।

ঘাট গেলো। এবার মন্দির। কাশীতে মন্দির বড়ো কম নেই। ছোট হলেও তাদের পরিচয় দেওয়া দরকার।

বিশ্বনাথ মন্দির॥ কাশীর বিখ্যাত কচুরিগলির পথ বা চকের দিক থেকে একটি সরু গলি দিয়ে বিশ্বনাথ মন্দিরে যাওয়া যায়। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে বেশি দূরে নয়—এই পৌনে এক মাইলের মতো। দূর থেকে মন্দিরের সোনার চুড়ো দেখা যায়। সাধারণত তীর্থযাত্রীরা বিশ্বনাথ গলি দিয়ে মন্দিরে ঢোকেন। এখন যে মন্দির, তার কাছেই পুরনো মূল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মুসলমান আক্রমণকারীরা বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙে চুরে তছনছ করে দেয়। বহু ধনরত্ন লুঠপাট করে। এখনকার মন্দিরে যে সোনার চুড়ো তাতে সাড়ে বাইশ মন নিখাদ সোনা আছে। এটা মহারাজ রণজিৎ সিং-এর দান। গম্বুজে নানা দেবমূর্তি খোদাই করা।

আকবরের রাজসভায় রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল প্রতিষ্ঠা করেন 'জ্ঞানব্যাপী' অর্থাৎ জ্ঞানকূপ। সেটাও আওরঙ্গজেব নষ্ট করেন।

এখনকার মন্দির রাণী অহল্যাবাই-এর তৈরি। সেটা ১৭৮৫ সালের কথা। তাঁর তৈরি অহল্যাঘাটের কথা আগেই বলা হয়েছে। মন্দিরের ঢোকার পথে যে বিশালাকার ঘণ্টা, সেটি নেপালরাজের

দান। মন্দিরের সামনেই মণ্ডল আর পশ্চিমে দণ্ড পাণিশ্বরের মণ্ডপ। প্রলয়ের দেবতা মহাকালের দ্বাদশজ্যোতি লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথও আছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, শিবলিঙ্গ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রতীক।

অন্নপূর্ণা মন্দির॥ বিশ্বনাথ মন্দিরের অদূরে অন্নপূর্ণা মন্দির। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি। পুরাণে আছে ভিখারি শিব মা অন্নপূর্ণার কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন।

প্রতিবছর কালী পুজোর সময় 'অন্নকূট' উৎসব হয়। সেই সময় দেবীর সোনার প্রতিমূর্তি দেখা যায়।

জ্ঞানব্যাপী কূপ বা জ্ঞানকূপ॥ বিশ্বনাথ মন্দিরের পিছনে এই কূপ অবস্থিত। শোনা যায় বিশ্বনাথ দেবের বিগ্রহ এই কূপ থেকে পাওয়া গেছে।

ধুন্দুরাজ গণেশ॥ বিশ্বনাথ মন্দিরে ঢোকার মুখেই এই মন্দির। বিগ্রহ আশীর্বাদের মুদ্রায় দাঁড়ানো। যেন সমবেত ভক্তজনকে আশীর্বাদ করছেন। বলা হয়, মহারাজ দেবীদাস গণ্ডির পাষান দিয়ে বিগ্রহটি তৈরি করেছেন।

কালভৈরব মন্দির॥ চকের কাছে অষ্টভৈরবের অন্যতম। কাশীখণ্ড আর স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে।

কেদারেশ্বর মন্দির॥ কেদার ঘাটে অবস্থিত। দক্ষিণভারতীয়রা বিশেষভাবে এখানেই আসেন। তাঁদের বিশ্বাস, বিশ্বনাথের পরেই ইনি। এঁর স্থান। বছরে কার্তিক মাসের প্রতি সোমবার উৎসব হয়। দেব সেনাপতি কার্তিক তারকাসুরকে বধ করেছিলেন। সেই উপলক্ষে এই উৎসব। বারানসীর প্রাচীন দ্রষ্টব্য বলতে এটিও।

দুর্গা মন্দির॥ রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে। সামনের সরোবরের নাম দুর্গাকুণ্ড। কাশীতে এসে রাজরাজেশ্বরী জগন্মাতার মন্দির দেখা অবশ্যই কর্তব্য।

তুলসীমানস মন্দির ॥ দুর্গামন্দির সংলগ্ন এই মন্দির তুলসীদাস প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে রাম সীতা লক্ষ্মণ মূর্তি আছে আর আছে হনুমানদেবের বিগ্রহ। একদিকে হরপার্বতী অন্যদিকে বিষ্ণুলক্ষ্মী।

সংকটমোচন ॥ হনুমান মন্দিরের বাঁদিকে। মঙ্গল শনিতে পুজো হয়।

ভারতমাতা মন্দির ॥ দুর্গা মন্দিরের কাছে, বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পথে।

এছাড়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিদ্যাপীঠ, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ভিজিয়ানাগ্রাম প্রাসাদ এবং রামনগর দুর্গ অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এই রামনগর দুর্গে যাবার জন্যে আমরা টাঙ্গা ভাড়া করেছিলাম। বারানসী উল্টোদিকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূর। বাসও আছে। মালব্য সেতু পার হয়ে হাঁটা পথেও যাওয়া যায়। দুর্গ এবং রাজার প্রাসাদ কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের আমলে ১৭৫০ সালে তৈরি হয়। গঙ্গাপুর থেকে রাজধানী রামনগরে নিয়ে আসা হয়।

এখন প্রায় যদুঘরের মতো সাজানো, সুরক্ষিত। অস্ত্রশস্ত্র বর্ম বল্লম তরবারির সংগ্রহ দেখার মতো। এছাড়া আছে নানারকম সুদৃশ্য, হাতির দাঁতের কাজকরা পালকি. সিংহাসন, তৈলচিত্র। বিস্ময়কর সব সংগ্রহের পরিমাণ। দেখতে-দেখতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বর্তমান কাশীরাজ আর তাঁর দুই কন্যাকে দেখলাম ছাদের উপর বিশ্রাম করছেন।

তিতি বলে উঠলো, রাজাদের ঠিক মানুষের মতন দেখতে না বাবা? আশ্চর্য তো?

ওর কথার জবাব না দিয়ে প্রাসাদের পিছনে গঙ্গার কাছে চলে এলাম। সেখানের মন্দিরে পুজাপাঠ শুরু হয়ে গেছে। ঝোলানো ঘণ্টা বাজছে। সন্ধের রাঙা রোদ্দুর পড়েছে গঙ্গার জলে। দুর্গ বন্ধ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দুর্গের বাইরে এসে পড়লাম।

ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। দুর্গের মধ্যে, প্রাঙ্গণে ছাড়া হরিণ। আপনমনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এতো তাড়াহুড়োয় এসব জিনিস দেখা হয় না। যদি কাশী থাকি, আরো একবার আসবো ভাবলাম।

চুনার

কাশী থেকে চুনার ৩৭ কিলোমিটারের মতো। চুনার দুর্গ দ্রষ্টব্য। আফগানরাজ শেরশাহ সুরী একটি তৈরি করান। ১৬ শতাব্দীতে মোগল বাদশাহ হুমায়ুনকে হারিয়ে শেরশাহ সিংহাসনে বসেন। কাশী থেকে নিয়মিত বাস।

জৌনপুর ॥ ৫৮ কি.মি.। জৌনপুরের মুসলমান নবাবরা শিল্প ভাস্কর্যের খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন। সমাধিস্তূপ ছাড়া বিশালাকার সব প্রাসাদেই আফগান স্থাপত্যের ছাপ। না দেখলে জীবনে এক বিশেষ দ্রষ্টব্য অদেখা থেকে যাবে। জৌনপুর বিখ্যাত তার আতর আর সুরভির জন্যেও। কাশী থেকে নিয়মিত বাস। ট্যাক্সিও আছে। থাকার জন্যে পূর্ত বিভাগের বাংলো ছাড়াও কিছু ছোটবড়ো মাঝারি হোটেল আছে। সুন্দর ছিমছাম শহর।

টানডা প্রপাত ॥ ৯৫ কি.মি.। পিকনিকের উপযুক্ত জায়গা। পরিপ্রেক্ষিত জুড়ে জঙ্গল। বাস নিয়মিত কাশী থেকে।

উইনডহ্যাম প্রপাত ॥ কাশী থেকে ৯১.৫ কি.মি.। সুন্দর পিকনিকের জায়গা।

থাকার জায়গা ॥ রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম। বারাণসী ক্যানট রেলস্টেশন: রিজার্ভেশন—স্টেশনমাস্টার। মাথাপিছু ১০ টাকা দিনে, দুজনের জন্যে ২০ টাকা।

ট্যুরিষ্ট ডাকবাংলো এবং ক্যারাভান পার্ক। দি মল টেলি—৬৪৪৬১ মাথাপিছু ২০-২৫, দুজনের জন্যে ৩০-৪০। রিজার্ভেশন-ম্যানেজার।

ইউ পি টি ডি সি ট্যুরিস্ট বাংলো। প্যারেড কুঠি, বারানসী টেলি—৬৩১৮৬, ৬৭১১৪।

ডিলাক্স ঘর মাথাপিছু ১২ টাকা, ডবল ২০ টাকা। সাধারণ ৮ টাকা। রিজার্ভেশন : রিজিওনাল ট্যুরিস্ট অফিসার।

ইনটারন্যাশনাল গেস্ট হাউস। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। মাথাপিছু ৪·৫০। ২·৫০ শয্যা।

রিজার্ভেশন : রেজিসট্রার, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, টেলি—৬২৫৫৮, ৬৪৪৯১।

ধর্মশালা॥ অন্নপূর্ণা তেলওয়ালা ধর্মশালা, লুকসা হরসুন্দরী ধর্মশালা, গোধুলিয়া জৈন ধর্মশালা. মৈদাগিন জয়পুরিয়া অতিথি ভবন, গোধুলিয়া লখনউ ধর্মশালা, বুলানালা।

নাটকোট ধর্মশালা, গোধুলিয়া
পানডে ধর্মশালা, গোধুলিয়া
রেওয়াভাই ধর্মশালা, মৈদাগিন

	এসি	সিঙ্গল	ডবল
পশ্চিমী কেতার হোটেল।।			
ক্লারকস হোটেল		৮০	১৪০
দি মল, টেলি ৬২০২১-৩	এসি নয়	—	—
ক্লারকোটেল			
বারানসী হোটেল	এসি	৯০	১৫০
দি মল, টেলি ৫২০৫১-৯	এসি নয়	৭০	১২৫
ট্যুরিজম			

অন্যান্য হোটেল ॥

হোটেল ডি প্যারিস	এসি	৭০	১২০
দি মল, টেলি ৬৪৪৬১	এসি নয়	—	—
হোটেল প্যারিস			
অশোক হোটেল	এসি	৫৫	৬৫
বিদ্যাপীঠ রোড, সিগরা	এসি নয়	৩০	৪০
টেলি ৫২০ .৭			
ইণ্টারন্যাশানাল হোটেল	এসি	৫০	৬০
লোছুরাধর, টেলি ৬৭১৪০	এসি নয়	৩৫	৪০
শ্রজয়া হোটেল	এসি	৫০	৬০
লোহুরাধর, টেলি ৬৪৭৭৮	„ নয়	২৫	৩০-৪০
৬৪৩৩৪			
হোটেল ইনডিয়া	এসি	৪০	৬০
৫৯ প্যাটেল নগর কলোনী	„ নয়	২৫	৪০
পুষ্পাঞ্জলি	এসি	—	—
লোহুরাধার, টেলি ৬৪৩৩৪	„ নয়	১৫-২০	৩০
হিমালয় হোটেল			
বরুণা ব্রিজ, টেলি ৫২০৭৭	এসি নয়	১৫-২০	২৫-৩০
হোটেল নটরাজ	„	১৫	২০-৩০
লোহুরাধর, টেলি ৫৪০১২			
সেনট্রাল হোটেল	এসি নয়	১০	২০
দশাশ্বমেধ, টেলি ৬২৭৭৬			
কে এম এম			
মাছোদার, টেলি ৬২৬৩৬	„	১০	২০
মিনট হাউস মোটেল			
নাগেসার, টেলি	„	১০	২০

শ্রীভেঙ্কটেশ্বর লজ
দশাশ্বমেধ, টেলি ৬৬৮০০ এসি নয় ৬-১০ ৮-১৫

কে ভি এম হোটেল
গোধুলিয়া, টেলি ৬৩০৪৯
মর্ডান লজ, লোহুরাবির
টেলি ৬৩২১৩
নিউ ইমপিরিয়াল হোটেল
লছমী কুণ্ড
টেলি ৬২৯৮৩

} এগুলির ভাড়া মোটামুটি ৫-১০ টাকা সিঙ্গল ১৫-২০ ডবল

গাইড সারভিস। ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসের মাধ্যমে এদের নিয়োগ করা হয়।

	১—৪ জনের জন্যে	৫—১২ জনের জন্যে	১৩ জন এবং অধিক
অর্ধেক দিন (৪ ঘণ্টা)	২৪ টাকা	৩০ টাকা	৩৬ টাকা
পুরা দিন (৮ ঘণ্টা)	৩২ টা.	৩৬ টা.	৪২ টা.
কাশীর বাইরে	২৪ টা.	৩৬ টা.	৪২ টা.
	৪৫ ←	→ ৫০ ←	→ ৫৫ টা. (খাওয়া সুদ্ধ)

ট্রাভেল এজেন্ট।

সীতা ওয়ার্লড ট্রাভেলস, বারানসী হোটেল, টেলি ৫২৯৪৫
ট্রেড উইংস, ক্লারকস হোটেল, টেলি ৫৪৯৫৮
ট্রাভেল করপোরেশন অফ ইনডিয়া (পি) লিঃ
ক্লারকস হোটেল, টেলি ৬৩২৯১

ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেণ্টার

গভ: অফ ইনডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস

১৫ বি, দি মল, ক্যাণ্টনমেণ্ট টেলি ৬৪১৮৯

গভঃ অব ইনডিয়া ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন কাউণ্টার

ভরতপুর এয়ারপোরট

ইউ পি গভঃ ট্যুরিস্ট ব্যুরো

প্যারেড কুঠি, ক্যানটনমেনট, টেলি-৬৩১৮৬

কাশী থেকে	আগ্রা	৩৭৯	মাইল	৬১০	কিলোমিটার
,, ,,	এলাবাদ	৭৯	,,	১২৭	,,
,, ,,	বোধগয়া	১৪৯	,,	২৪০	,,
,, ,,	কলকাতা	৪২১	,,	৬৭৮	,,
,, ,,	দিললি	৪৪১	,,	৭১০	,,
,, ,,	খাজুরাহো	২৫২	,,	৪০৬	,,
,, ,,	লখনউ	১৯৮	,,	৩১৯	,,
,, ,,	লুম্বিনি (কোশল)	২৪০	,,	৩৮৬	,,
,, ,,	নালন্দা	২০৪	,,	৩৮৬	,,
,, ,,	রাজগীর	১৯৩	,,	৩১১	,,
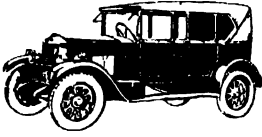
কাশী থেকে মোগলসরাই

রেলের জংসন স্টেশন মোগলসরাই। অনেক দিনের শোনা। তার ওপর দিয়ে বহুবারই গেছি। নামা হয় নি। নামার দরকারও হয়নি। অথচ কাশী থেকে সামান্য দূরে। রেলে বাসে জীপে মোটরে—যাতে হোক যাওয়া চলে।

মৃণালের ঠিকানা সঠিক জানতাম না। জানতাম, কোথায় কাজ করে। কলকাতা আপিস থেকে বদলি হয়ে মোগলসরাই এসেছে। টেলিফোন গাইড দেখে ওর আপিসে ফোন করে দিলাম। ও ভাবতেই পারে নি। বললো, আপনারা যে যেখানে আছেন থাকুন, আমি যাচ্ছি। সঙ্গে গাড়ি আছে, এক্ষুণি আপনাদের নিয়ে আসবো।

সেদিন আসা হয় নি। মৃণাল এসেছিলো। আমরা কাশীর পাট তুলে দুটো দিন হাতে করে সোজা মোগলসরাই, মৃণালের বাড়ি, এবং মৃণালের গাড়ি চেপে। আপিসের গাড়ি। মহলী অপিস। মনে পড়ছে যেদিন ওর ওখানে সেদিনটিই দেয়ালি। বিশাল ছাদে উঠে বাজি পোড়ানো, হৈ চৈ, আকাশের দিকে তাকিয়ে নতুন নতুন আতশবাজি দেখা! ঠিক ছেলে বয়সে ফিরে যাওয়া একবার, বহুকাল বাদে। ছেলেপুলেদের সঙ্গে নেভা সাজানো বাতি আলসের ধারে ধারে গিয়ে জ্বালানো। বাতাসের সঙ্গে দু হাতে লড়াই।

সন্ধে থেকে গভীর রাতপর্যন্ত এইসব, নির্দোষ আনন্দ।

দুচার চক্করে মোগলসরাই। তার বাজার এলাকা, দোকানপাট এইসব দেখে মনে হলো এখানে বাঙালীর সংখ্যা খুব একটা কম না, অনেক। বাজারে মাছের দরেই তা মালুম হলো।

যেখানেই যাই, আমি বাজারে বেড়াই সবার আগে। বাজার হাট কোন জনপদের হৃদয় বিশেষ। ওখানে গেলে সেই জায়গাটা সম্বন্ধে চটপট ধারণা হয়ে যায়। দেয়ালি হিন্দিভাষী মানুষগুলোর খুব বড় পরব। দোকানে দোকানে মিঠাই-এর পাহাড়। ঝলমলে আলো। আতর সুগন্ধি। দুদিকের ঘরবাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। সব মফঃস্বলেই যেরকমটা চেহারা হয়, তেমন।

রেলগাড়ির শহর মোগলসরাই। রেলগাড়ির রং-এ বাড়িগুলোর রং। এখনো এদিক-ওদিক যথেষ্ট সবুজ। রাস্তায় হরদম গাড়ি-ঘোড়া মানুষ আর মানুষ। ছোট্ট ঝুড়ির মতন শহর উপচে পড়ছে মানুষ আর মানুষ। সুন্দর দুটো দিন কাটিয়ে সোজা মোগলসরাই থেকে কলকাতা।

পটিদার-পাড়ায়

বিনপুর পৌঁছুলাম দুপুর একটা দেড়টা নাগাদ। ঝাড়গ্রাম থেকে বেলপাহাড়ি যেতে পথে পড়ে এই বিনপুর থানা। থানার মিছরিদানাকে ঘিরে ধরে গুটিকয় গাঁ। বামুনকায়েতের উঁচুঘর, জলাজোত বাদ দিলে বেশ কিছু আদিবাসী পল্লী, মাহাতো পাড়া। পেটপুরণ চাষে বাসেই। এছাড়া দোকানপত্তর করা, শাকসবজি বেচা পার্ট টাইম। শুনেছিলাম, গাঁয়ের নাম ষাঁড়পুর। থানার কোল ঘেঁষে মাটিবালির কাঁচা পথ। সেই পথ ধরে খানিকটা বাইরে গেলেই পটিদার পাড়া। পটিদার, মানে পোটো, পটুয়া। ভদ্দর উপাধি চিত্রকর।

এঁদের নিয়ে ছবি বানাতে এসেছেন এক তরুণ চিত্রকর, নাম পূর্ণেন্দু পত্রী। কলকাতা থেকে। তিনি ছবি আঁকেন। এখন এসেছেন অন্যরকম চিত্রকরের সন্ধানে। ষাঁড়পুর ছাড়িয়ে তিনি ও তাঁর দলবলের গাড়ির চাকার দাগ বালির শান্তি কেটে চলেছে তো চলেইছে। আমরা দাগের পিছু নিলুম। এছাড়া, হাতের মুঠোয় সঠিক খবর বলতে কিছু নেই। দাগ ধরে পৌঁছুলুম এসে দিঘির পাড়, বটের ধার।

এই ভরদপুরেই মাদল! নিশ্চয় ওইখানেই আমাদের কার্য-সিদ্ধি। অনুরোধের আসর মাৎ করে মাদলে কাঠি পড়ছে। মাথায় চড়া রোদ মিঠে। বনজঙ্গল কন্টিকারিঝোপঝাড় থেকে গুটি গুটি পা পা ঠাণ্ডা তখনো। বেশি নয়, কম নয়। আমরা মাদল-আন্দাজে একটা মহল্লার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ষাঁড়পুরে একটা প্রাথমিক স্কুল পেরিয়ে এসেছি। পথের

দুপাশে পাকা ধান। কোনো কোনো মাঠ ন্যাড়া। ধান কাটা হয়ে গেছে। দূরে ইটখোলা একটা বাঁহাতি। ছায়ার নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে গরুর গাড়ী। খড় তোলা হচ্ছে দুপাশের বাড়িতেই ধান ঝাড়াই বা ধান ভানার শব্দ। ধুলো, ধান, বনফুল—একটা পাঁচ মিশেলি গন্ধ মিশিয়েছে বাতাসে। খেঁজুর গাছ অল্পই। তার মুণ্ডু চেঁছে, কাঠি গুঁজে রস সংগ্রহ। ভাঁড় দেখে বোধহলো রস সামান্যই হয়। কাঠিতে শালিখ আর ফিঙের ঝগড়া।

দুধারে সুন্দর সুঠাম মাটির বাড়ী। দরজার গোড়ায় আলপনা, লক্ষ্মীর পা, দেয়ালে হাত ছাপ, রঙফুল—দেখতে-দেখতে উজিয়ে গেছি। সামান্য যা আছে, তা-ই গুছিয়ে রেখেছে এই সমস্ত সংসারের মানুষ। মাচায় ধুঁধুল, তাই সই। বরবটির দিকে তাকাইনি।

কলকাতা থেকে এতাবৎ এসে গেছে অনেকেই। তবে, হয়তো এতো শব্দ করে নয়। শুনলুম, ব্রতচারী মিউজিয়ম থেকে এসে অনেক পট কিনে নিয়ে গেছেন এক সংগ্রহকারী। মিউজিয়মে রাখা আছে। দাম? দামের অঙ্ক ঠিক নেই। দেড়শ থেকে পঞ্চাশে নামে। বেশি হলে থাউকো কেনা।

বিনোদবিহারী বর্ষীয়ান পটিদার। ছ সন হলো চলে গেছেন। তাঁর ছেলে—নিজে পট আঁকে না। ছোট ছেলে, যার সঙ্গে দেখা আমাদের—তার চাষের কাজ। নিজের জমি ভিটের লাগোয়া। জমি সামান্যই। পরের ক্ষেতে খেটে পয়সা পটিদারদের পাঁচ ছ ঘর। কারো ঘরই খুব বড়ো না। তিনচার ছেলেমেয়ে, বাস।

এখন সবচেয়ে বয়স্ক পটিদার যুগল। বয়েস?

তা বাবু চারকুড়ি হবে—

হিসেব নেই। আমাদের চোখে ষাট-পঁয়ষট্টির বেশি হবে না। ওর সঙ্গে গল্পগুজব করছিলুম, দাওয়ায় বসে। অনেকেই ভিড় করে ছিলো। পটিদার কেউ, কেউ মাহাতো। যুগলের ঠাকুদ্দার

বাবা সেই মানভূম-শিকারভূম থেকে এসেছিলেন। প্রথমে গিয়েছিলেন ধলভূমগড়। সেখানে হয়তো সুবিধে করতে পারা যায়নি। সেখান থেকে কীভাবে কবে বা কেন যে এখানে এসে পড়লেন, জানা যায় না। বলবেনই বা কে? বলার দরকারই বা কী? তবু যুগলই কিছু না কিছু ঠুকঠাক কথা বলে চলছিলো।

পড়াশুনো?

দু-একজন করেছে। ঝাড়গ্রামের কোরটে কাজ করে একজন। আর একজন প্রাইমারি পাশ। আর কেউ না। পাশ করে হবেটা কী বাবু?

তা তো ঠিকই।

ডাকঘর নেই। গাছের গায়ে লাল বাকসো টাঙানো। অঞ্চলপ্রধান আছেন। সাহাবাবুদের জোত আছে। মাটির কুমোরবাড়ীর সামনে দোতলা ইটের নতুন বাড়ী। তাদের বাড়ীর ছেলে ঝাড়গ্রাম কলেজে বি এস সি পড়ে। প্যানটের ভিতর গুঁজে নাইলন শারট। মুখে পালিশ, ব্যবহারে, কথাবার্তায়। পটিদারদের হয়ে ছেলেটি কথা বলে। এরা না-হিন্দু না-মুসলমান। বিয়ে থা' নিজেদের মধ্যে। কেউ পোড়ায়, কেউ গোর দেয়। কেউ আবার পুড়িয়ে গোর দেয় ছাই। পুজোপাট সিন্নি সব আছে। বিয়ের পাট মেশানো। দিনের বেলা বিয়ে। ছেলেরা ছোট থেকেই পটের কাজ শেখে। মেয়েরা নয়। মেয়েদের ঘরের কাজ। ছেলেরা যায় পাথর কুড়োতে ঝোরা-ঝর্ণায়। লাল, নীল, বেগুনি পাথর কোঁচড় ভর্তি। পাতা পুতা ছিঁড়ে আনে। কুড়িয়ে ছিঁড়ে আনে শিউলি জবা পুঁইবিটুলি লালপাট—কতো কী। ওই সব দিয়ে রং হবে। গেরিমাটির দেশ। রং কেনে না এরা। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে রং নিয়ে এসে পট ভরায়। যমপট, মনসাপট। মানচিত্রের মতন দুই কাঠিতে জড়ানো চিত্রবিচিত্র এই পট কীট আর পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বনতুলসীপাতা নিমপাতা থাকে-থাকে পুরে দেয়।

যুগলের দুঃখ পট করে পেট ভরে না। পট আর পেটের কতখানি তফাৎ ওর জানা নেই। আর দুঃখ, ছেলেপেলেদের দিষ্টি এদিকে কমছে।

বলে—বিবেচনা করুন ক্ষেতে খাটা আর পটে খাটা—দুটোর কী আশমান-জমিন ফারাক।

এতো গেলো খালি ভাণ্ডারপুরের পাঁচ-ছ ঘর পটিদারের কথা। মেদিনীপুরের এ অঞ্চলেই আরো কয়েকটা জায়গা আছে, যেখানে এদের বাস। কাঁকোর কাছে আমডাঙা, জয়পুর, কেঁদুলী আর কুই-এর কাছে হাঁড়দায় বেশ কয়েক ঘর পটিদার চিত্রকরের আবাস। এবার ভাণ্ডারপুর ছাড়িয়ে, সময় সুযোগ মতো ওই-সব অঞ্চল ঘুরে দেখা, বাকি।

জঙ্গলে সবুজ বিপ্লব

ভেবেছিলাম, জঙ্গলের মধ্যে ডাকবাংলোটা দেখেই ফিরে আসবো। উপরি হিসেবে পাবো, জঙ্গলে আসা-যাওয়ার রোমাঞ্চ, হঠাৎ জানোয়ারের মুখোমুখি হবার বাসনা ও ভয়। বনগন্ধ পাবো। বিকেলের রোদ পাতায় কাটাছেঁড়া হয়ে নেবুফালির মতন ছড়িয়ে পড়েছে, দেখতে পাবো। দেখতে পাবো কোন জলঝর্ণার উঁকিঝুঁকি। অরকিডে ফুল। পরগাছার দোলনা। আলকুশির কাছির গাছ বাওয়া—এইসব। ইতস্তত ঝার্নারি। উঁচুনিচু পথ ১৩ মাইল। দুদিকে শাল, সেগুন, আবলুশ কাঠের ঘনজঙ্গল। জঙ্গলে হাতি, হরিণ, চিতা। হাতি ধানক্ষেতে নেমে গেছে। কেননা, ক্ষেতের ধানে ধরেছে পাক। ঝুঁঝগো রাতে হরিণ চিতার জন্যে 'ওয়াচ-টাওয়ার' তৈরি। প্রায় পাঁচতলার সমান উঁচু সেই কাঁচকাঠঘর। যার ইচ্ছে উঠে রাতভোর বনজন্তুর জন্যে চোখ মেলে রাখতে পারে। বিশেষ করে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাদের দেখা যাবেই। ভাল্লুক আছে, বয়া আছে। বাইসনও আছে কিছু কিছু। অজগর আর গোক্ষুরের রাজত্ব এই জঙ্গল। নানা ধরনের বিষাক্ত সরীসৃপ আছে, বিছে আছে।

এখন আছে, অল্প শীতের আমেজ। খোলা জিপে মোটা গেঞ্জি এঁটে আমরা এঁকেবেঁকে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। বেলপাহাড়ি থেকে রাস্তা পিচের। সোজা বাঁশপাহাড়ির আরেকটি বাংলো পর্যন্ত চলে গেছে। বেলপাহাড়ি থেকে ২২।২৩ কিলোমিটার হবে। আমরা ওই পথ ধরে মাঝামাঝি এসে বাঁ হাতি রেনজ আপিস পাক দিয়ে কাঁকড়ঝোড়ের দিকে। পুরোটাই বনপথ। কাছেপিঠে বসতি নেই। অন্তত চোখে তো পড়ল না। দূরে থাকলেও থাকতে পারে।

আমি জঙ্গলের গল্প ফেঁদে বসিনি। বলতে বসেছি তাদের গল্প যারা এই জঙ্গলের মধ্যেই, পাহাড়ের ছায়ায় বসে ঝোরার শীতল জল ছিটিয়ে ক্ষেতখামার গড়েছে। কালোর দিকে গড়িয়ে পড়ছে যে-সবুজ, সেই সবুজ-কালো শান্তি ওদের মুখে লেপাপোঁছা। মানুষগুলোর ঘরগেরস্থালি দেখলে চক্ষু জুড়োয়। অনেক ক্ষেতখামার আর ঘর ঘুরে বেড়ানো লোক আমি। হঠাৎই এসে পড়ে মনে হলো যেন, স্বর্গের রং সবুজ হতে বাধ্য। সবুজ, কিন্তু কালোয় ঘেঁষে সবুজ।

কী ভাবে এলাম একটু বলি। আপনাদের মধ্যে কেউ, ইচ্ছে করলে, দুটো অবকাশের দিন পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন। চলে আসুন সোজা। ঝাড়গ্রাম ষ্টিলে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ। তিন ঘণ্টায় পৌঁছে দেবে। ঝাড়গ্রামে বাংলো আছে। রাতটা বাংলোতে কাটাতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয়, দেবেন আচার্যি-মশাইকে একটি চিঠি ছাড়া। শান্তিনিকেতন বোর্ডিং-এর পুরানো বাড়ীর পাশে নতুন দুতলা বাড়ি উঠছে। ঝকঝকে বাড়ি। সঙ্গে আলাদা বাথ। খাটবিছানা মশারি সব আছে। বিজলী বাতি আছে। খোলা বারান্দা আছে। সুস্বাদু খাবার আছে। মাছ ভাজা, মাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি। যা খাবেন—সবই পাবেন। সেই সঙ্গে দরদ। এমন দরদী হাতের সেবাযত্ন 'আচার্যি-নিকেতন' ছাড়া আপনি কোথাও পাবেন না।

এবারে ব্যবস্থা করতে হবে একটি জিপ! তাও, আচার্যি-মশাইকে একবার বলে দেখতে পারেন। ঝাড়গ্রাম থেকেই পেতে হবে। বেলপাহাড়ি পর্যন্ত বাসে যেতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকে? আরো ভালো হয়, যদি কলকাতা থেকেই জিপে আসেন। রাতটা আচার্যির অতিথিশালায় থেকে ভোরে বেড়িয়ে পড়ুন। এখানের সবকছুির নামই কাঁকড়াঝোড়। গাঁয়ের নাম ওই, জঙ্গলের নামও ওই কাঁকড়াঝোড়। দেখেশুনে, সেই 'তকাই'-এর গল্প মনে

পড়ছে। যার নিজের নাম তকাই, বাবার নাম তকাই, মার নাম তকাই। সবার নামই তকাই।

আমরা এক তকাই-কাঁকড়াঝোড় আজব দেশে এসে পৌঁছুলাম।

বাংলোটার পাশ দিয়ে টিলার ঢালে নেমে এসে দাঁড়ালাম যেখানে পুকুরের পাশে—সে একটা বিশাল আমগাছ। তমালের মতো পাতা, আমের মতো নয়, অথচ আম, বুনো আম—গাঁয়ের ছেলেরা বললো। প্রচুর আম হয়। এখন গাছতলায় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে গরুর গাড়ি। গরু চরছে মাঠে। মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে আগের সপ্তাহে।

ছোট এই চাষী পাড়া বেড় দিয়ে মাটিবালির পথ গেছে। আমরা সেই পথে। বাঁহাতি ঝকঝকে বাড়িঘর দুয়োর। দেয়ালে আলপনা। দোরগোড়ায় ছাপছোপ। এক ধরনের গাছের আঠা পিটুলিগোলা জলের মতন। সেই আঠা ছিটিয়ে ছিটিয়ে সুন্দর সহজ সব কল্কা উঠোন পর্যন্ত ছুটে চলে গেছে। নবান্ন শেষ। তুলসীমঞ্চের মতন ঢিপি তৈরি উঠানের একপাশে। সেখানে মাটির পিদ্দিম। ঠাকুর-ঠুকুর বলতে ওই। নতুন কাপড় গা থেকে এখনো খোলেনি কেউ। ময়লা এখানে কম হয়। কোরা কাপড় ধুলেও দাগ উঠতে মাস দুই।

যেদিকে চোখ পড়ে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। ক্ষেতে বেগুন মুলো রাঙা আলু থেকে শুরু করে, মাচায় শিম, বরবটি, ধুঁধুল থই থই করছে। ডাকাতে শিম, ডাকাতে বরবটি। বরবটি একটা হাতে ছিঁড়ে মেপে দেখি প্রায় দুহাত। ভিতরে নধর কলাই—পেট ভর্তি মাংস। ধুঁধুল চাষ করতে হয় না। বুনো ধুঁধুল মুক্তকেশী বেগুন ফলেছে প্রায় সব ক্ষেতেই। ফুলকপি বাঁধাকপি আছে, পালং নটে আছে, লাউ চালকুমড়ো প্রতি চালে। অড়রের ডাল করেছে। সর্ষে পিঁয়াজ আদা, কী নেই? মেটে কুমড়ো লাগিয়ে দিয়েছে বেগুন

ক্ষেতে। রেড়ির গাছ খাড়া হয়ে উঠেছে। ঢেঁড়শ ইয়া লম্বাপানা। অর্থাৎ গাছপালা, ফসলে মাঠ থই থই। গর্তপানা পুকুর ভর্তি মাছ। ডালপালা ফেলে রেখেছে, যাতে চুরি না যায়। পুকুর সবার নেই। গোটা পাড়ায় শুধু দুটোই পুকুর। তার দরকারও নেই। জলের জন্যে ঝোরা আছে। ঝোরার জলেই চান খাওয়া কাচাকাচি, ক্ষেতে জল দেওয়া, সবকিছুই চলে। ক্ষেত গাঁয়ের দরজা থেকে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত চলে গেছে লম্বালম্বি।

বড়ো গাছ বলতে কাঞ্চন। সেই কাঞ্চনের পাতাও ভাজা খাওয়া চলে। আরেক ধরনের লতা দেখলাম। ওরা বললো, খাম্বালু। শিকড়ের কাছে খাম্বার মতন লম্বাচওড়া বিশালকায় আলু। আমাদের আলুর বদলি হিসেবে চাষ করে। কখনো বন খুঁড়ে নিয়ে আসে, ওদের মধ্যে গরিব যারা।

হাঁস মুরগি ছাগল গরু ফি ঘরেই। সে-মুরগি লড়ায়ে—মুরগির মতন পালোয়ান সব। মোগরগুলো তেড়ে এলে, সমীহ করে দুপা পিছোতেই হয়।

মুগ্ধ বিমূঢ় চোখে এইসব চতুর্দিক দেখতে দেখতে এক চাষী-বাড়িতে ঢুকে পড়ি। দরজার পাশে পৈটেয় বসে ছিল অনন্ত মুণ্ডা। কাপড়ের খুঁট পিঠ পেঁচিয়ে বুকের কাছে। শান্ত ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি। ক্ষেতের পানে তাকিয়ে বসেছিল। আমাদের দাঁড়াতে দেখে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

জল চাই। জল খাওয়াবে একটু ?

ভিতরে নিয়ে গেলো অনন্ত। আমরা ওর মাটির তকতকে বারান্দায় জুবড়ে বসলাম। বাড়ির মেয়েরা খাটিয়ায় বসে চুল বাঁধছিল। আমরা হঠাৎ যাওয়ায় বিস্ময় আছে, অকারণ লজ্জা পেয়ে উঠে যাওয়া নেই। বাংলায় কথা বলে। একটু অন্য ধরনের বাংলা। বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বাবুই-ঘাস বুনেছে একটা ক্ষেতে। খুব দামি ঘাস। ইংরিজি নাম 'স্যাভয়'। বললাম এ-ঘাস দিয়ে কী করো ?

দড়ি। খাটিয়ার দড়ি। যত বাঁধা-ছাঁদার কাজে লাগে, হরেক কাজে লাগে।

মনে পড়লো, ঝাড়গ্রামের কাছে একটা কাগজকল হয়েছে সম্প্রতি। আরো একটা হবার কথা আছে, এই জেলাতেই। বাবুই-ঘাসের চাষ বাড়লে খুব দামী কাগজ পাওয়া যেতে পারতো। চাষীরাও দাম পেতো। ওদের ঘাস এতোই কম যে নিজেদের কাজে লাগে। চাষে কোন কষ্ট নেই। ঘাস থেকেই বীজ পেয়ে যায়।

সামনের ওই পাহাড়টার ওপারেই বিহারের গন্দনিয়া গ্রাম। হাট বসে হপ্তায় দুবার। কাঁকড়াঝোড়ের এই ফসল সব ওই গন্দনিয়ার হাটে যায়। এখান থেকে দু কোশ পথ—এই একটুকুন। বেলপাহাড়ি তো ছ কোশ।

দাম কেমন মেলে ?

ভালোই। বেগুন দেড় টাকা কিলো। নধর বেগুন। দেখলুম। কলকাতায় অবশ্য ওই বেগুন আড়াই-তিন। অনন্তর উঠোনের একটা দিকে ঢেঁকিঘর অন্যদিকে গোয়াল। জাল শুকোচ্ছে চালের মাথায়। কাঁসার চিকণ ঘটিতে জল এলো পাতার ওপর ক'ডেলা গুড়।

যদি আসি, তোমার বাড়িতে থাকতে দেবে ?

কেনে ? বাংলো তো কাছেই বাবু। বাংলোতে উঠবেন। সব বাবু তো ওখানেই ওটেন।

আমরা বাবু নই।

অনন্ত হাসে। সবাই ওকথা বলে—আসবেন তো ?

নিশ্চয় আসবো। সবুজ স্বর্গরাজ্যে অনন্ত-রা কোন রাসায়নিক সার লাগায় না। ওদের সেই পুরনো ব্যবস্থা, গোবর মাটি পচানি

খড়—এইসব। এই সব দিয়ে জমিতে হীরে ফলিয়েছে। জমিতে ক্ষেতি হচ্ছে আট থেকে দশ বছর—একতোড়ে। অনন্তদের মুখে-চোখে সীমাবদ্ধ পাহাড়ের শান্তি, সুস্থ ভয়। বেশি ওরা চায় না। চেয়েও পাবে না জানে। কবে কতদিন আগে ওর বাপ ঠাকুদ্দারা কোন আপন আদিবাসী পাড়া থেকে উঠে এসেছিল, সে খবরে ওদের দরকার নেই। এখানে মুনডা আছে মাহাতো আছে। সব মিলিয়ে বারো-চোদ্দ ঘর। গাঁয়ের মাঝে বটগাছে লটকানো আছে একটা লালরঙের পোস্টবাক্স। শহরের সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ—এইভাবে।

টিলা পেরিয়ে, বাঁহাতে বাংলো রেখে গরুর গাড়ির মতন গাঁয়ে নেমে এসেছি। দূর থেকে এই গাঁ-র টান জবরদস্ত। তার কাছে নতিস্বীকার না করে আমার উপায় নেই।

বিকেল প্রায় ফুরোতে বসেছে। গাঁয়ে চক্কর মেরে উঠে আসবো বলেই, এই নামা। নামি, উঠতে দেরি হবে না। চৌকিদারকে খত্ দেখিয়ে দরজা খুলে ঝাঁটপাট লাগাতে বলে এসেছি। টয়লেটের বালতিগুলো ভরাট করতে বলে এসেছি। মুরগি রাতে চলবে—এমন একটা আশা প্রকাশ করে এসেছি। আর কী চাই?

কাঁকরাঝোড় জঙ্গলে

কাঁকর আর ঝোরা—এই দুটো মিলে কাঁকরাঝোড়। মেদিনীপুরের শেষ সীমায়, টাটা পাহাড়ের কোলে। গভীর জঙ্গল শাল-শিমুল আসন সেগুন অর্জুনের। গ্রামের নাম কাঁকড়াঝোড়। বেলপাহাড়ি থেকে সোজা পীচপথে বাঁশপাহাড়ি। মাইল পনেরো-ষোলো। তার মাঝামাঝি বাঁহাতি পথ জঙ্গলে ঢোকার। মরাম-কাটা পথ উঁচুনিচু। সেই পথ ধরে মাইল দশেক ভিতরে গেলে পর বাংলো। টিলার মাথা কেটে বসানো কাচঘর। সামনে ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি। একপাশে নেবুঘাসের জঙ্গল। চাষ করা হয়েছে। জঙ্গলে কফি চাষ হচ্ছে। আঙুর কমলা পরীক্ষামূলকভাবে ফলানো হচ্ছে। কাজু হচ্ছে। স্যাভয় ঘাস গজাচ্ছে দড়ি-দড়ার জন্যে। কাগজ কলের জন্য। ঝাড়গ্রামে কাগজকল তৈরি হয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় আরো একটা কল হবে, শুনে এলাম।

ঝাড়গ্রামে অনেকবার গিয়েছি। সেখান থেকে বেলপাহাড়ি। বেলপাহাড়ি বনবাংলোয় থেকেছি। সুন্দর বাংলো। লাগানো গাছ-পালার ভিতরে তিনঘর, সামনে বারান্দা, বারান্দায় ক্যাকটাসের টব। বারান্দার নিচে ঘাসের বিছানা। এদিক-ওদিক ফুলের গোছ। যে কোন ট্রেনে ঝাড়গ্রাম। সেখানে পছন্দসই খাবারের আর মাথাগোঁজার জন্যে বিনোদ আচার্যির দরবার। শান্তিনিকেতন বোরডিং। আমাদের বিনোদদা পুরনো আটচালার পাশে নতুন হোটেল বানিয়ে দিয়েছেন। তিনতলা বাড়ি। ঝকঝকে ঘর স্নানঘর বিছানা বালিশ। বাংলো-কানা-করে-দেওয়া আতিথেয়তা। কী চাই? কোন মাছের কোন প্রিপারেশন দরকার, মুখ ফুটে বললেই বিনোদদা তৈরি। কলকাতা থেকে একটা চিঠি ছাড়ুন। তারপর

বেরিয়ে পড়ুন। ঝাড়গ্রামে থানার পেছনেই ঘোড়াধরা বাংলো। বনবাংলো ইস্টিশনের কাছে। ডি এফ ও ঝাড়গ্রামকে লিখে দেখতে পারেন।

এখন শালের জঙ্গলের নিচে জড়ো হয়ে আছে শুকনো পাতা। মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। ভোরবেলায় একটু শীত। সন্ধে থেকে মধ্যরাত চমৎকার। টের পাচ্ছি শিমুল মাদারের রক্তপাত বন্ধ হয়ে আসছে। পাতার আকুলি-বিকুলি। এদিকে পলাশ—পলাশই সব। বেলপাহাড়ি যাবার রাস্তার দুধার পুড়িয়ে খেয়ে এখন চুপচাপ। এদিক পানে ক্ষেতখামারের বেড়া রাঙিয়ে রাখে তেপল্তে। এদিক-কার সবই অন্যরকম। জঙ্গলের ভেতর মুখ গুঁজে ঘরবাড়ি। উধাও রাস্তা। কেচেন্দা বাঁধের দিকে যাওয়া যায়। যাওয়া যায় রাজ-বাড়ির দিকটায়। সেবায়তনের দিকে কিংবা, ঠিকঠাক কিছু না ভেবে রাস্তায় গড়ানো। গড়ানো কথাটা ভেবেচিন্তেই বসালাম। এতো পরিচ্ছন্ন, কাদাহীন রাঙা ধুলো-মাখা পথ-ঘাট আর বুঝি কোথাও নেই। শুকো খরা ভাব বুকের দুটো পাল্লা খুলে দেয় এখানে। লোকে যে কেন ঘাটশিলা-শিমুলতলা করে, তা আমি বুঝে পাই না। তা বলে শহুরে ভাব কি নেই? আছে। কিন্তু, সে-ভাব বাজারের বেড়া ডিঙিয়ে ইতিউতি পাক খায় না। শহরের সুবিধেটুকুন পুরোপুরি নিয়ে স্বার্থপর দৈত্যের মতো সুখভোগ করার জন্যে, আমি তো বছরে বারকয়েক ছুটি। ছুট কি আর শেষ হয়? ছুট শুরু ঝাড়গ্রামে, দৌড় বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি, কাঁকো—বীনপুর, শিলদা পেরিয়ে পেরিয়ে ধানক্ষেত, জনবসতি।

বেলপাহাড়ির পথে একটা জায়গায় আপনি থমকে দাঁড়াবেনই। চোখের সামনে খুলে উঠবে টানা ভুরুর মতন জঙ্গলের দাগ। শালচারা লাগানো হয়েছে। শৈশবে কেমন স্থির থাকে এবং এই পড়ন্ত বিকেলে। সামনে হাটখোলা খেলার মাঠ। তাহলেও?

ঐ জঙ্গলের শুরু। ওখান থেকেই। ছোট-বড়-মাঝারি গাছের

জঙ্গলে চোখ আটকে যায়। বনমুরগি এপাশ থেকে ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁপরূপ বর্ণনার বাইরে। বাঁদিকে দূরে সেই বিখ্যাত টেরেন। জঙ্গল আর পাহাড়। আস্তে আস্তে উঁচুতে উঠছি আমরা। কাঁকরাঝোড় তো খোদ পাহাড়। বেল-পাহাড়ি তার উপর হলেও সমুদ্দুর পিঠ থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে।

তবে গাড়ি একটা দরকারই। জিপ গাড়ি। কাঁকড়াঝোড় যেতে দুটো টারনিং পয়েনট আছে, যা জিপ ছাড়া আর কিছুর পক্ষে এঁটে ওঠা শক্ত। কলকাতা থেকে সোজা না পেলে, ঝাড়গ্রাম থেকে চেষ্টা করতে হবে। বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি পর্যন্ত তো বাসেই স্বর্গে পৌঁছুবেন। তৃতীয় স্বর্গ, এই কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে, তার বাংলোয় যেতে জিপ গাড়ি দরকার এবং দরকার আগাম যোগাযোগ ডি এফ ও ঝাড়গ্রামের সঙ্গে। তিনি অনুমতি না দিলে বাংলোয় ঢুকতে পারবেন না!

গত বছর দোলের সময়টা ঝাড়গ্রামে কেটেছে। তার আগে সিমলিপাল জঙ্গল এক রকম ঘোরের মতন। আবার তারই মধ্যে বিখ্যাত খৈরীর সঙ্গে মোলাকাত। খৈরীর সঙ্গে পুরনো আলাপ আমার। বন্ধুদের সঙ্গে এই প্রথম। জশীপুরে থেকেই চৌধুরী সাহেব আমাদের জঙ্গলে যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এবং সেদিন রাতেই। আমরা আমাদের অ্যামবাসাডর রেখে ওঁর জিপে চাহালা, নোয়ানা, বরেহিপানির বাংলো থেকে বাংলোয় দৌড়ে বেড়ালাম দুদিন। কিন্তু সে অন্য গল্প। গত বছরের। এ বছর কাঁকড়াঝোড়ই মাথায় থাক। সিমলিপালের তুলনায় সে হলো ধানদুব্বো। তাই সই। দুর্গা সাউ কাঠের ব্যাপারী। ধরে পড়লাম, গাড়ি বের করো। জঙ্গলে যাব। কাজে-কাজেই তো জীবনটা কাটালে। এবার দুদিনের অকাজ। নিমেষে জঙ্গল কিনে নেয় এই দুর্গাদারা। জঙ্গলে এমন সঙ্গীরই দরকার। সঙ্গে আমার বন্ধু

ডঃ শম্ভুলাল বসাক। গাছপালার ডাক্তার। জংলা পাট-বীজ খুঁজতে যাচ্ছে—আদিবাসি মহল্লায়।

ভোরে বেরিয়ে শিলদায় মাছ-ভাত। বেলপাহাড়ি টপকে গাড়ি ছুটছে কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলের দিকে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে এই জঙ্গল কেবল ফসকে যাচ্ছে। আজ বাগে পেয়েছি। শেষ দেখে ছাড়বো। ঠিক দুক্কুর গড়িয়ে বিকেলের মুখটায়। আলো পশ্চিম থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে পথের ওপর। একটা গন্ধ পাচ্ছি। নাকের পাটা ফুলিয়ে ধরার চেষ্টায় ফল হচ্ছে না। বনগন্ধ বড়ো পাঁচমিশেলি। জঙ্গল তো আর একা কাউকে নিয়ে নয়!

জঙ্গল বেশ গভীর। হাতি ভাল্লুক আর লেপর্ড খুবই মেলে লোকে বলেছে। একটা সময় প্রচুর জন্তু-জানোয়ার দেখা যেতো। সেজন্যে 'ওয়াচ টাওয়ার' তৈরি। আমরা ওয়াচ টাওয়ার কাটিয়ে বাংলোর দিকে। পথে মুরগি পড়েছে আকছারই। বুনো শুয়োর ক্ষুরে মাটি ঘেঁটেছে বেশ ক জায়গায়। এখন ঠিক জন্তু-জানোয়ার বের হবার সময় নয়।

কোথা থেকে জল পড়ার শব্দ কানে আসছে। ঝর্ণা-কছমের জিনিসে ছেয়ে আছে এই পাহাড় জঙ্গল। এঁকেবেঁকে আমাদের জিপ এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। কোথাও বন পাতলা হয়ে আসছে। কোথাও জমজমাট। ভেতরে চোখ চলছে না। পথে গাড়ির চাকার দাগ বিস্তর। ডানহাতি বাঁহাতি ট্রাক যাবার নিজস্ব পথ বানানো হয়েছে। একদিকে মাকড়ভুলা, কদমডিহা। রাস্তা সামনে দুভাগ হয়ে গেছে। ফলকে লেখা পড়ে জানা গেলো, বাঁহাতি পথ তামা তোলার জায়গায় নিয়ে যাবে। কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রসপেকটিং চলছে। বছর আড়াই হলো ক্যাম্প ফেলে ভূবিজ্ঞানীর দল এই জঙ্গলের একটেরে পড়ে। কাল দেখা যাবে। আজ সোজা বাংলো।

বিকেল হয়ে আসছে সেই সঙ্গে কেমন একটা ছমছমানির ভাব।

সর্বত্র। গাছের পাতাপুতাও নড়ছে না। গন্ধ থমকে আছে ধোঁয়ার মতন। পাঁচমিশেলি গন্ধ। শালের রস ছাড়া তামা হতেই পারে না। সেই রসেই ধুনো। লোধারা গাছ চেঁছে সেই ধুনো চুরি করে বাজারে বেচে। কেঁদু পাতা তো আছেই। কেঁদু পাতার রং ঘন সবুজ, কালোর থেকে এগিয়ে। কেঁদুই আবলুস।

চাষবাস পুরোদমে চলছে। চন্দন চাষ হচ্ছে গুটিপোকার চাষ হচ্ছে। কফি আঙুর সরবতী লেবু চাষ নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে জোরদার। বনবিভাগই করছে। সিট্রোনেলা বা নেবু ঘাসের চাষ সর্বত্র। এই ঘাসকে স্থানীয় সবাই 'ধন্বন্তরী' হিসেবে মানে। কাটা-ছেঁড়া পোড়া ঘায়ে টিপে রসটুকু লাগিয়ে দিলেই, ব্যস। এই ঘাসের চাষ চা-বাগান অঞ্চলে প্রচুর দেখেছি। পড়ো পতিত বাগানগুলোয় ঢালাও চাষ হচ্ছে! এই ঘাসের নির্যাস সিরাপ, ওষুধ প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে। বিদেশে রফতানিও হয়।

ধান ভানতে শিবের গীত দ্রুত শেষ করা দরকার। সন্ধের মুখে বাংলোয় পৌঁছুলাম। রাত হতে বাকি। 'ওয়াচ টাওয়ার' টানছে ক্রমাগত। বেশি রাতের আগেই ওখানে পৌঁছুনো দরকার। আকাশে চাঁদ জ্বলছে। আমাদের আলো দেখিয়ে কালোর কাছে নিয়ে যাবে। কালো মানে জীবজন্তু। কালো মানে হিংস্রতা। মানুষ দেখলে ওরা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখ খুলে দাঁড়ালাম। চোখ তো নয়, খুরপির মতন চক্কর দিয়ে ঘুরছে, কুপিয়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিক। যাকে দেখতে চাই, সে কোথায়? কোনদিকে?

চলো দিললি

আজ থেকে বছর পনেরো ষোলো আগে সর্বপ্রথম দিললি যাই। না, কোনো কাজেকর্মে নয়। এমনিই বেড়াতে। তখন আমি দড়িছেঁড়া গরু। কাজ ধরি আর কাজ ছাড়ি। পাকাপাকিভাবে ঘর গেরস্থলি বুকে চেপে ঠেসে বসেনি। তাই বিটু যখন বললো, আমি যাচ্ছি তুমি যাবে নাকি? একটু দিললি ঘুরে আসি। কোনো খরচ খরচা নেই। একপিঠের গাড়িভাড়া যোগাড় করতে পারলে ভালো। না পারলে কুছ পরোয়া নেই। ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া পাবো—তাবে দুজনের অনায়াসেই হয়ে যাবে।

ওর ইনটারভিউ আছে। পি এইচ ডি করে এসেছে—ঐ দিললি থেকেই। পুনায় এখনো ওর বন্ধুবান্ধব বহুৎ আছে। কটা দিন ঝমঝমিয়ে চলে যাবে আঁচ করে 'ঠিক হ্যায়' বলে দিলুম।

বিটু মানে আমার ছোটবেলার ইস্কুল বয়েসের বন্ধু। কৃষি-বিশেষজ্ঞ। গাছপালা নিয়ে ওর আমার দুজনের কারবার। তবে দুরকমের। তাতে কিছু এসে যায় না। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভিতরের ব্যাপার একটা। দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকলেও, আছে। থাকে।

ফলে, একদিন ভেসে পড়লাম। কলকাতার শীত যাই-যাই করেও যায়নি। সুতরাং দিললির ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করা যায়। কাপ-কাটা শীত। শীতবস্ত্র বলতে আমার হাতকাটা সোয়েটার সম্বল। কে যেন পুরো হাতের সোয়েটার একটা ধার দিল। বিটু বললো, আরে ওখানে চলো না। ওদের অনেক আছে। যার হোক একটা গায়ে চড়িয়ে নেওয়া যাবে। ওর

একটা ট্যুইডের কোট আছে। দিললি থাকবার সময় কোন এক সুদিনে বানানো। সেইটা আর দু তিন খানা প্যাণ্টুলুন। আমারও কিছুকিছু। এই নিয়ে দিললি-জয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আজ অমন এলোমেলো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটায় কেমন ধারা চাপ তৈরি হয়। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ফিরে ফিরে, ভাবার চেষ্টা করি, সত্যই কি ওভাবে গিয়েছিলাম? যাওয়া যায়? এখন ভাবতে পারি না। কাজ ছাড়া অকাজে আলস্যবিলাসে দিললি ঘুরে আসার কথা কল্পনাও মানে না।

অথচ গিয়েছিলাম তো। প্রায় সপ্তা দুই ছিলামও। আস্তানা পুনা ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাস। দুটো চৌকি জুড়ে তিনজনের শোওয়া বসা করা। তিনজন, না চারজন? বোধ করি চারজনই, দুজনের ঘর—আমরা দুই বাড়তি। বিজু আর আলির ঘর। নাকি বিজু, মানে বিচিত্রর একলার? তবে ঘর যারই থাকুক, আমরা পাঁচ ছ'জন উল্লুক একটা ঘরেই গুলতানি মারতাম। রাত একটা-দুটো আকছারই হতো। ওরা পালা করে একদিন করে সঙ্গ দিতো আমার। সেদিন তার ডিপার্টমেনটে যাওয়া হতো না। বা, গিয়ে ঝাঁকিদর্শন দিয়েই পালাতো।

আমরা পুষায় ঐ হসটেলে শিকড় বসিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার পেতে ফেললাম।

বিশাল ক্যামপাস। গাছপালা থই থই করছে চারদিক। দুদিকে আসা-যাওয়ার চওড়া পীচের রাস্তা। নানা বিভাগীয় আপিস, প্রসাসন-বাড়ি, স্টাফ কোয়াটার, অধ্যাপক-আবাস, হরেক হস্টেল—কী নেই। সমস্তই ঐ বিশাল ক্যামপাসের ভিতর। আমাদের হসটেলটার নাম পোসট গ্রাজুয়েট হস্টেল। সবাই ডাক্তার হবার তালিম নিচ্ছে। বিটু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তুষার হয়েছে। সোমনাথ, বিজু, আলি—সবাই। আমি কমপাউনডার। হসটেলটা বোধ করি তিনতলাই হবে। শত শত ঘর। লম্বা

বারান্দা। উধাও ছাদ। বাঁধের মতন আলসে। সামনে যোগেন ভিলা আর চেরিফুলের গাছ। রঙিন চেরিফুল ডালপালা ছেয়ে ফেলেছে। পাতা শূন্য ঐ গাছগুলো ঘিরে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে কালো ভোমরা আর হলদেটে মৌমাছির ঝাঁক। ঝিঁঝি পোকা আর বোলতার গুলতানি সর্বত্র।

বেশ ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা জব্দ করার জন্য মাথা পাকিয়ে মাফলার আর জোব্বার মতন তুঁষের চাদর। কার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আজ আর মনে নেই।

আগে থেকে খবর দেওয়াই ছিলো। স্টেশনে হাজির বিজু আর আলী। তুষারের, কাজ পড়ে গেছে, আসতে পারেনি। হাতচিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে—আমি আজ সন্ধের ব্যাপারটার দায়িত্ব নিচ্ছি। বিজুদার ঘরে হবে। আমার রুমমেট সুবিধের নয়।

প্ল্যাটফর্মে নামতে-না নামতেই এই সুখবর। সবাই লম্বা লম্বা পা ফেলে স্টেশন থেকে বেরুবার দরজার দিকে। স্কুটারের সারির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইরের একবারে অন্যপ্রান্তে পুষা। বেশ ক মাইল হবে। তাছাড়া ক্যামপাসের গেট থেকে হস্টেলটাও দূর আছে। ওরা সাইকেলে যাতায়াত করে। আমি আবার ও জিনিসটায় কখনো বিশ্বাস করিনি। শিখতে পারিনি। সুতরাং টের পেলাম, ওদের কপালে দুঃখ আছে। আমাকে পেছনে বসিয়ে আসা যাওয়া করতে হবে। গেট পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। তারপর, তো দিল্লি দেখা।

আমরা সন্ধের অপেক্ষায় মনে মনে মশগুল হয়ে উঠি। বিটুর ব্যাগেও একটা আছে। কলকাতার মাল। সুতরাং, সুরুটা বেশ জমিয়েই হবে আন্দাজ করা যাচ্ছে। শুরু ভালোয়-ভালোয় হলে, শেষটা কোনো ভাবনাই থাকে না।

হাতমুখে জল লাগিয়ে হস্টেল থেকে বেরুলাম। চা জল-খাবারের জন্যে পাশের বাড়ি যেতে হবে। ওখানেই পাকশালা।

দুবেলা খাবারের জন্যেও তাই। এইটাই একটু ঝঞ্ঝাটের মতন। তা, কী করা? যেখানে যা নিয়ম! আর এক মুশকিলে পড়লাম প্রায় যাওয়ামাত্রই। পরোটা ভেজে এলো। মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে আনলুম। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো। কী ব্যাপার?

—ভুল করে নারকোল তেল ফেলে দিয়েছে নাকি হে? বিচ্ছিরি···

ভুল নয়, এই খেতে হবে। কেরালার ছেলেদের সঙ্গে আমাদের এই কিচেন। অন্যেরা তো মাছ ছোঁবে না। তাই মাছের লোভে নারকোল তেল গিলে মরছি। তবে খাঁটি। এক-আধ বেলাই অসুবিধে হবে। তারপর ঠিক অভ্যেশ হয়ে যাবে। খেয়ে ফ্যালো। নাক টিপে খাও। সেই কাল সন্ধেয় কখন কী খেয়েছো!

যমুনা ব্রিজের কাছে আমাদের গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওই প্রথম যমুনা-দর্শণ। কিন্তু যমুনা কোথায়? দিগন্ত-ছোঁয়া বালির চড়া আর তার মধ্যে তরমুজলতা। এক একটা মাথা জুড়ে ঝাঁপিতে সাপের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে তরমুজের লতা। ফনফনিয়ে বাড়বে। একটু হাওয়ার ছিটে, একটু বালির আর ভিতরে আদর-সোহাগ যমুনার কালো জলের তো আছেই। আর কী চাই। গোটা দিল্লির চাষীর মুখে হাসি। সুন্দর বনের তরমুজের মতন ছোট নয়, ঢাউস ভূমণ্ডলের মতন বিশাল আর অন্তররাঙা।

গাছপালার মধ্যে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। গমের নানান ভ্যারাইটি—উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হয়েছে। আছে নানারকম অর্চারও। ফুলের গাছ। রকমারি ফুলের চাষ করা হয়েছে। ম্যয় গাঁজা ডিভিশন পর্যন্ত। তাতে ফুল এসেছে। পাতাগুলো চেরা চেরা। অনেকটা ঢেঁড়স জাতের গাছ। ফুল শুকোলে, ফুলের কাছ বরাবর কিছু পাতা ও বীজ ছিঁড়ে পকেট ভর্তি করলাম। ঘরে ফিরে সেগুলো দুটো ভারি ট্রাংকের মাঝখানে রেখে চেপে-পিষে

ফেলা হলো। তারপর বেকিং পর্ব অর্থাৎ শুকিয়ে নেবার পালা। রোদ্দুরে তো আর ঢেলে শুকোবার উপায় নেই। হসটেল, প্রচুর ছেলেপুলে। তারা দেখলে কী ভাববে? সুতরাং, টেবিল ল্যামপের গোল শেড উলটো করে দিয়ে তাতেই ক ঘণ্টা রাখা। ডুমের আলোর জোরে সেগুলো আধশুকনো! কলকে কোথায় পাওয়া যাবে? চারমিনারের তামাক বের করে, পাতা মিশিয়ে, সিগারেট খোল খানিকটা খালি করে, তার ভেতর ধীরে-যত্নে পোরা। তারপর কাঠি ধরানো। তিনটানে পুড়ে ছাই। আমাদের লোকসংখ্যা তো বড়ো কম না? সুতরাং, শ্রমমূলক এই নেশাভাঙ করতে বহুৎ রাত কেটে যেতো। মাঝখানে ইনটারভ্যাল মতন, ঘর থেকে বেরিয়ে আসা। তারপর আবার টাটে বসা। এইভাবে দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিলো।

কোনো কোনদিন আলি তার ল্যাবোরেটরি থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে রেকটিফায়েড স্পিরিট নিয়ে আসতো। ইথাইল এ্যালকো-কোহলকে রি-ডিসটিল করে নির্ভাবনাময় সেই মদ্য পরিবেশিত হতো পাতে পাতে। সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে জল আর মিঠে পানি। নয়তো খাওয়া অসম্ভব। কেউ বলতো, প্রসেস করা নেই বলে খেয়ে মজা নেই। কিন্তু, আমরা তো আর মজা মারতে বসিনি? গরিবের ঘোড়ারোগ হলে যে কোনো ওষুধই ওষুধ! দিন একরকম ভাবে কেটে যাচ্ছিলো।

কে যেন বললো, কী রে দিললি এলি, ঘরের মধ্যেই জমে থাকবি নাকি? একটু ঘুরে-ঘারে দেখ?

গেলেই হয়।

ঠিক হলো, কাল 'বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক দেখতে যাওয়া হবে। সারাটা দিন ওখানে কাটিয়ে সন্ধের ফেরা। টিফিন বাক্সে দুপুরের খাবার গুছিয়ে নেওয়া। এছাড়াও যদি কিছু লাগে ওখানে কেনা যাবে। কিছু ফলমূল। ওয়াটার-বটলে জল।

বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে বাচ্চাকাচ্চা বাড়ির সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যায়। শীতের দিনে ঘুরে ঘুরে, কখনো বসে, আড্ডা মেরে, দিনটা কাটানো। ছুটি-ছাটার দিনে অতোবড়ো পার্ক উপচে পড়ে ভিড়ে।

আমাদের পূষা থেকে বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক বেশি দূর নয়। কলকাতার যেমন হর্টিকালচার গারডেন বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক তেমনিই একটি পার্ক। তবে অনেক বেশি সাজানো গোছানো। অনেক বেশি সুন্দর। উঁচুনীচু টিলা মাঠ জমি নিচু জায়গা সবকিছুকে ঠিকঠাক ব্যবহার করা হয়েছে। কারোর ছাড়ান ছোড়ন নেই। উপরে ফুল, নিচেয় ফুল, মাঝে ঝুলে-থাকা ফুল-বাগিচা আর তার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রঙিন ফোয়ারা। নানা রঙের ছাতা। তার নীচে মানুষ। আলস্য-বিলাসে একটা দিন ফুরোতে এসেছে। সাঁতারের পুল আছে। সেখানে আলাদা পয়সা দিয়ে সাঁতারে নামে ছেলেমেয়ের দল। ঘণ্টা পিছু জলবিহার। রেস্টুরেণ্ট আছে। একটা দিনের জন্য যা কিছু উপভোগ্য সব মিলবে বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে।

আমাদের মত আধাবুদ্ধেরও একটা দিন কেটে গেলো সহজে, অনায়াসে। একটু বিকেল-বিকেল বেরিয়ে পড়লাম। করলবাগে যাবো। সেখানে বটুকদা থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। দীর্ঘকাল দেখা নেই। ডি. কে অর্থাৎ সিগনেট প্রেসের সেই দিলীপ কুমার গুপ্তের বাড়িতে 'হরবোলায়' বটুকদা আমাদের গাধা-গলায় গানের ঘণ্টা বাঁধার চেষ্টা করতেন। বটুকদা কবি। বটুকদা নাট্যকার। বটুকদা আমাদের চিরদিনের ভালোবাসার মানুষ। সেই তিনি আমাদের ছেড়ে বহুকাল দিললিতে। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে, একবার প্রণাম না করে কীভাবে দিললি ছেড়ে যাবো? পাপ হবে না? তাছাড়া, 'কুয়োতলা' বলে একটা বই আমার বেরিয়েছে, কিছুদিন হলো। যেটা, ইচ্ছে, বটুকদাকে দিই। ওটা আর একটা পদ্যর বই।

দুটো বই বগলদাবা করে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বটুকদার বাড়ির

দিকে। ঠিকানা জানি না। দিললিতে ঠিকানা না জেনে কিছুই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। করলবাগে গিয়ে দুটি বাঙালী পরিবারে, ঢুঁ মারলেই বটুকদার তল্লাস মিলবে—নিশ্চিত বিশ্বাসে চলে গেলাম। আর সত্যিই সোজা বটুকদার বাড়ি। দুর্ভাগ্য উনি ছিলেন না। আমি বই দুখানা রেখে এলাম। ওঁর ছেলের সঙ্গে দেখা। বললাম, আর একবার যাবার আগে ঘুরে যাবোই, বটুকদাকে বলো।

করলবাগ কফিখানায় কফি খেয়ে সেদিনের মতো পুষার কোটরে। তারপর কেমনধারা নেশা লেগে গেলো। ঘরের বাইরে একবার গেলে যেন আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। বা ফিরলেও, বাহির তোমার সমগ্র ধরে টান মারে। তখন তুমি নিজের হাতে নেই। তখন তুমি বাহিরের। সেই বাহিরের খোঁজ খবর এখন দেবো। দিললির যা যা দ্রষ্টব্য পুরো দুদিনে একজন সাধারণভাবে দেখতে পারেন, কিন্তু, তাকে ঠিক আমরা দেখা বলবো না। বলবো, তিনি নামে পর্যটক, অন্যত্র যাবার ফাঁকে দুদিনের অবসরে দিললির দ্রষ্টব্য দেখে গেলেন মাত্র। আর কিছু নয়। যেভাবে, যে সীকোয়েনসে দেখলে মাত্র দেখা হতে পারে আমরা তা সাজিয়ে দিচ্ছি পরপর। সঙ্গে সামান্য ধরতাই, একটু বিবরণ। কেননা, এখানে তার বেশি সুযোগ আমরা নিতে পারি না।

যেখানে যাবেন	তার অবস্থান
যন্তর মন্তর	পারলামেনট স্ট্রিট
পারলামেনট হাউস	
লোদী সমাধি	লোদী রোড
সফদরজঙ্গ সমাধি	শ্রীঅরবিন্দ মার্গ
মোথ কি মসজিদ	সাউথ একসটেনসন ২

যেখানে যাবেন	তার অবস্থান
হাউসখাস	শ্রীঅরবিন্দ মার্গ থেকে-
কুতুবমিনার	শ্রীঅরবিন্দ মার্গ
শামসি তলাও	মেহরাউলি
খিরকি মসজিদ	খিরকি গ্রাম
তুঘলকাবাদ	বদরপুর রোড
অশোকের শিলালিপি	কালকাজি
খান-ই-খানানের সমাধি	নিজামুদ্দিন
হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া	”
হুমায়ুনের সমাধি	”
পুরানা কিল্লা	মথুরা রোড
ইণ্ডিয়া গেট	রাজপথ
ফিরোজ শা কোটলা	বাহাদুর শা জাফর মার্গ
খুনি দরওয়াজা	”
রাজঘাট	মহাত্মা গান্ধী মার্গ
শান্তিবন	”
বিজয়ঘাট	”
লালকেল্লা	নেতাজী সুভাষ মার্গ
সোনেরি মসজিদ	চাঁদনী চক
জুম্মা মসজিদ	”
অশোকস্তম্ভ	সবজিমনডি
মিউটিনি মেমোরিয়াল	”

অশোকের শিলালিপি আর অনুশাসন

দশ কিলোমিটার দূর। সাম্প্রতিক এই শিলালিপির আবিষ্কার দিল্লিকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে।

ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামটার নাম বাহাপুর—কালিকা দেবী মন্দিরের কাছে। এই মৌর্য শিলা-লিপি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথের পাশেই স্বভাবত উৎকীর্ণ থাকে।

অশোক স্তম্ভ

সবজিমনডির কাছে বেলেপাথরের তৈরি এই স্তম্ভ। তৃতীয় শতকের পরবর্তী নির্মাণ বলেই মনে হয়। ফিরোজ শাহ কোটলা মীরাটের কাছাকাছি কোন অঞ্চল থেকে এই স্তম্ভ দিললি নিয়ে আসেন।

ফিরোজ শা কোটলা

বিখ্যাত 'তোঘলক রুইনস'। দিললি গেলে এই ধ্বংস বিনাশের স্পর্শ না নিয়ে আসার কোন অর্থ হয় না। ১৩৫৪ সালে তৈরি সুন্দর সেই পঞ্চম দিললির নাম ছিলো ফিরোজাবাদ। এই ধ্বংস বিনাশের ছবি তিন কিলোমিটার বিস্তৃত। ভাঙাচোরার মধ্যে থেকে জেগে উঠে দাঁড়িয়েছে অশোকস্তম্ভ। স্তম্ভের উপর ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা শান্তির বাণী। স্তম্ভটির ওজন হবে ২৩ টন। ভাঙা-চোরার পাশেই জামা মসজিদের ধ্বংসস্তূপ। বলা হয়, তৈমুর লঙ আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাতে এসে এর সৌন্দর্য এবং গঠনশৈলীতে এতোই অভিভূত হন, যে সমরখন্দে অনুরূপ একটি মসজিদ তৈরি করান।

হাউসখাস

দূরত্ব সাড়ে দশ কিলোমিটারের মতো। আলাউদ্দিন খিলজির আমলে ১৩০৫ সালে সিরির অধিবাসীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে বিরাট 'রিজার্ভার'টি তৈরি। এটিই 'হাউজ'। সেই হাউজ থেকেই হাউসখাস। দ্বিতীয় দিললির ধ্বংসাবশেষ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এর একটা অংশ এখনো দেখা যাবে, যেখানে

গুহাগুলি এমনভাবে তৈরি যাতে শীতে গরম বোধহয় এবং গরম কালে ঠাণ্ডা। ফিরোজ শা আর তাঁর ছেলে-নাতিদের কবরও দেখা যেতে পারে। সকাল-সন্ধে খোলা। হাউসখাসে চড়িভাতি করতে অনেকেই যায়। তার জন্যে তৈরি হয়েছে হাউসখাস পিকনিক হাট। দশজনের জন্যে ১১ টাকা ভাড়া। রিজার্ভেশন : এ্যাসিসট্যানট ডিরেকটার, ডি ডি এ হরটিকালচার, বিকাশভবন, নয়া দিললি। টেলি : ২৭২৭৫৯।

হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া

শেখ নিজামুদ্দিন চিশতির দরগা প্রায় ৫ কিমি। মুসলমান তীর্থস্থান। জায়গাটার নামকরণই এঁর নামে। তিনি দেহান্তরিত হন, তা হলো ১৩২৫ সালের কথা। তাঁর সমাধির পর—এই গোটা অঞ্চলেই অভিজাত মুসলমানগণ কবরস্থ হয়েছেন। কবি মিরজা গালিবের সমাধিও এখানে। শাজাহানকন্যা জাহানারাও এখান-কার মাটির নিচে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। 'উরস' নামের বিখ্যাত উৎসবটি এখানেই হয়।

হুমায়ূনের কবর

প্রায় ৫ কিমি। জনৈকা বিধবা তাঁর স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে তৈরি করিয়েছিলেন। বাগানের মধ্যে সমাধির এটি একটি প্রথম সুষ্ঠু সুন্দর নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তাজমহলের পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। অন্যান্য মোগল রাজপুত্রদের কবর আছে। বাগিচা-সমাধি রচয়িত্রী হামিদা বানুর নিজের কবরখানাটিও এখানে। বাদশার নাপিতের সমাধি আছে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দরজা খোলা। প্রবেশমূল্য জনপিছু ৫০ পয়সা।

ইনডিয়া গেট

২ কিমির সামান্য বেশি। ৪২ মিটার উঁচু পাথরের স্মারক তোরণ বা বিজয়তোরণটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ৯০ হাজার ভারতীয়

সৈন্যের স্মৃতিতর্পণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। শহীদদের নামগুলি সমস্ত পাথরে খোদাই-করা।

জামা মসজিদ

সাড়ে ছ কিমির কাছাকাছি। ভারতের সবচেয়ে বড় মসজিদ। সম্রাট শাহজাহানের শেষকীর্তি। ৪০০ বর্গমিটার প্রাঙ্গণে পৌঁছুতে অসংখ্য সিঁড়ি। পুবদিকের সিংদরজার মধ্যে গ্যালারি রাজপরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট। এক একটি শ্বেতপাথর, এক একটি আসন। মিনারে ওঠার জন্যে মাথাপিছু ৫০ পয়সা দিতে হবে।

যন্তরমন্তর

এটি একটি অবজারভেটরী। জয়পুরের মিরজা রাজা জয়সিংহ ২ এটি তৈরি করান। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদও ছিলেন। বিশাল একটি সূর্যঘড়ি ছাড়া আরও পাঁচটি যন্ত্র—যা দিয়ে সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি সৌরমণ্ডলের যাবতীয় তারার গতিবিধি নিরীক্ষণ করা যায়।

খান-ই-খানানের সমাধি

প্রায় ৫ কিমি। চারদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা। মাঝখানে লাল বেলেপাথরের তৈরি সমাধি। এই আবদুর রহিম খান-ই-খানান ছিলেন মোগল দরবারের বিখ্যাত সেনাপতি। ১৬২৭ সালে মারা যান। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম। কবি হিসাবেও খ্যাত। তাজমহল সৃষ্টির ভূমিকায় মতন হুমায়ুনের কবরের সঙ্গে এর নামও করা যেতে পারে।

খিরকি মসজিদ

১৬ কিমি তো হবেই। খিরকি মানে জালিকাটা জানলা। সেই থেকে এই নাম। দুর্গের মতো চেহারার এই মসজিদ পর্যটকমাত্রেরই দেখা অবশ্য কর্তব্য। আর কোন মসজিদ দেখলে একঝলকে দুর্গ বলে মনে হবে না। কাছাকাছি বিজাই মণ্ডল আর বেগমপুর মসজিদও দ্রষ্টব্য।

খুনী দরওয়াজা

ফিরোজ শা কোটলার বাইরে। পুরানো কিল্লায় ঢুকতে পড়ে। এর খুনী দরজা নামকরণ হবার পিছনে কারণও আছে। ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের সময় শেষ মোঘলসম্রাটের ছেলেপুলে এবং পুরো আত্মীয়স্বজন সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কাউকে কাউকে আবার ফাঁসিতে লট্‌কে দেওয়া হয়েছিল।

লোদী সমাধি

৫ কিমি প্রায়। বিশাল বিস্তৃত লোদী বাগে সারি সারি কবর-খানায় শুয়ে আছেন সৈয়দ ও লোদীবংশের প্রতিপত্তিশালী রাজা-বাদশারা। মহম্মদ শাহী আর সিকনদার লোদী। বড় গুমবাদ মসজিদ সম্পর্কে এক গল্প আছে। যিনি এই মসজিদ তৈরি করেছেন, তাঁর নিজের সমাধি লুকোনো আছে মসজিদের নিচেই। দিললি বা এই ধরণের ঐতিহাসিক শহরগুলোয় যে কতো গল্প, কতো কিম্বদন্তী ছড়িয়ে আছে তা শুনে শেষ করা যায় না।

মোথ কি মসজিদ

লোদী ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। এখানেও বিস্ময়কর একটি গল্প, সুলতান সিকনদার লোদী তাঁর উজীরে আজমকে একটি ডাল দিয়েছিলেন। সেই সামান্য দান থেকে যে শস্য উৎপন্ন হয়েছিল তা বিক্রি করে এই মসজিদ তৈরি। সংরক্ষক এবং প্রসারের প্রতীক এই মসজিদ।

মিউটিনি মেমোরিয়াল

৯ কিলোমিটার। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে নিহত ইংরেজ সৈন্যের স্মরণে। বৃটিশরাজ-নির্মিত।

পার্লামেন্ট হাউস

দেড় কিলোমিটার। ভারতীয় সংসদভবন। ১৭১ মিটার ব্যাস।

পুরানা কিল্লা (পুরনো দুর্গ)

৩·২ কিলোমিটার। ছোট্ট টিলার ওপর দুর্গটি। তিনটে সিং-দরজা শের খান (১৫৩৮—৪৫) তৈরি করেছিলেন বলে শোনা যায়। চিড়িয়াখানার দিক থেকে ঢুকতে গেলে একটা টাওয়ার পড়ে। লাল বেলেপাথরের এই টাওয়ারের নাম শের মঞ্জিল। হুমায়ুন দিললি মসনদ পুনরুদ্ধার করার পর এই শের মঞ্জিলকে তাঁর লাইব্রেরি বানিয়েছিলেন। গল্পে আছে, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ শুনে তাড়াতাড়ি প্রার্থনায় যোগ দিতে গিয়ে ঠোক্কর খান হুমায়ুন। এবং সেইভাবেই তাঁর মৃত্যু।

অল্প দূরেই কিল্লা-ই কুহনা মসজিদ। শের মঞ্জিলের পিছনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে পুরাতাত্ত্বিক খননকাজের নিদর্শনগুলি পর্যটক অনায়াসে দেখতে পাবেন—মোগল, সুলতানীয়, রাজপুত, গুপ্তোত্তর যুগ, গুপ্ত কুষাণ, শুঙ্গ, মৌর্য। পুরানা কিল্লা ইন্দ্রপ্রস্থের উপরেই। পাণ্ডবদের রাজধানী। অদূরের এক যাদুঘরে ঐতিহাসিক প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি সুরক্ষিত আছে।

কুতুবমিনার

১৪·৪ কিমি। আকাশে বহুদূর বিস্তৃত এই মিনার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরি। ৭০ মিটার দীর্ঘ। পাঁচতলা। প্রথম তিনটে লাল বেলেপাথরের। বাকি দুটো মার্বেল আর বেলেপাথরের। প্রতিটি তলাই দেখতে আলাদা। মিনারটি জয়স্তম্ভ। মুয়াজ্জিন এখান থেকেই বিশ্বাসীকে প্রার্থনায় যোগ দিতে ডাকেন। প্রথম তলাটি কুতুবুদ্দিন আইবকের তৈরি। দাসবংশের প্রথম সুলতান ইনি, রাজপুতদের হাত থেকে দিললির সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিলেন। বাকি তলাগুলি আইবকের জামাই ইলতুতমিস তৈরি করান। চূড়াটি তৈরি করেন ফিরোজ শা তুঘলক। ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়। নতুন একটি তৈরি হয় বৃটিশ আমলে। কিন্তু, নামিয়ে আনা হয়। এখন

কুতুব বাগানে আছে। দোতলা পর্যন্ত ৪ জনের দল উঠতে পারে। মাথা পিছু ৫০ পয়সা।

কুয়াত-ই-ইসলাম মসজিদ : এক জায়গায় খোদাই করে লেখা ; ২৭টি হিন্দু আর জৈন মন্দিরের স্থাপত্য লুঠ করে এই মসজিদের অনেকাংশ বানানো। পুবদিকের সিং-দরজায় লেখা আছে।

লোহাস্তম্ভ : মসজিদ প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে ঐ লোহাস্তম্ভ। ১৬শ বছরের রোদবৃষ্টিঝড়ে এর গায়ে একফোঁটা মরচে ধরাতে পারেনি। মজার একটা ব্যাপার, এখানে এসে প্রায় সবাই করে, তা হলো—লোহার থামের গায়ে পিঠ লাগিয়ে পেছন দিয়ে হাতে হাত লাগানোর চেষ্টা। যদি কেউ লাগাতে পারে, সে অসম্ভব ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হয়।

অধম খানের কবর : ভুলভুলাইয়া নামেই বেশি পরিচিত। কুতুবমিনারের কাছে; মেহরাউলি গ্রামে এই আটকোনা কবর। লালকেল্লা থেকে গোপন সুড়ঙ্গ, শোনা যায়, এখানে মুখ খুলেছে। এটা একটা গোলকধাঁধার মতন, রাজপরিবারের কেউ সঠিক চিনে এই পথ দিয়ে বেরুতে পারে, আর কেউ নয়। বহু লোক পরীক্ষা করতে গিয়ে মারাও গেছে। এখন সুড়ঙ্গপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কুতুবকে কেন্দ্র করে অন্যান্য যা আছে, তা হলো—আলাই দরওয়াজা, আলাউদ্দিন আর ইলতুতমিসের সমাধি।

কুতুবে থাকার জায়গা

কুতুব বিশ্রামাগার। ডবল এসি ৩৫ টাকা।
রিজারভেশন। সেক্রেটারি, লেঃ গবর্ণর
রাজনিবাস, আলিপুর রোড
দিল্লি ১১০০০৬। টেলি ২২৫০২২

এছাড়াও, আই টি ডি সির কুতুব রেস্তোরা এই এলাকার মধ্যেই আছে।

রাজঘাট

৪ কি মি। জানুয়ারি, ৩১, ১৯৪৮ সাল মহাত্মা গান্ধীকে এখানে দাহ করা হয়। কালো চতুষ্কোণ মার্বেল পাথরের বেদী। চারিদিকে বিশাল সবুজ মাঠ। পরিপ্রেক্ষিত শ্রী অসম্ভব শান্তিপূর্ণ। বিদেশীদের কাছে এক বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রপতি ভবন

১·৬ কি মি। রাইসিনা হলের কাছে রাষ্ট্রপতির সরকারি আবাস। মোট ৩৩০ একর জমির উপর তৈরি। স্যার এডউইন লুতিয়েনস-নকশা অনুযায়ী তৈরি এই ভবনটি ১৯২৯ সালে প্রথম বাসের জন্যে খোলা হয়। সংলগ্ন গোলাপ বাগান। বছরে একবার-মাত্র জনসাধারণের দেখার জন্যে এই বাগানের দরজা উন্মুক্ত থাকে। যতদূর মনে পড়ছে ফেবরুয়ারি মাসে।

বিদেশীদের ভারত সরকারের পর্যটন-অফিস থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। যে কেউ ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সমরসচিবের কাছ থেকে পাশ যোগাড় করতে পারেন। তাঁর ঠিকানা : সমরসচিব, রাষ্ট্রপতিভবন।

লালকেল্লা

৬·৪ কি মি। ব্যবহৃত লাল বেলেপাথরের জন্যে কেল্লার রং লাল। সেজন্যেই এর নাম লালকেল্লা। অসমানুপাতিক আটকোণা এই দুর্গের পরিধি ২ কিমি। এককালে যমুনা নদী এর পাশ দিয়ে বয়ে যেতো। প্রধান ঢোকার দরজার নাম 'লাহোর দরজা'। কারণ, এই সিং দরজা লাহোরের দিকে তাকিয়ে। ডানদিকে ঘাসে-ঢাকা প্লাটফরম। স্বাধীনতা দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন।

এরপর সারবন্দী দোকানপাট। এককালে, মোগল আমলে

এটাই ছিলো মীনাবাজার। এখানে মোগল রাজপরিবারের মেয়েরা নানান জিনিসপত্র কেনার জন্যে ভিড় জমাতেন। অদূরে নহবৎ খানা। দিনে ৫ বার গান বাজতো সেখানে। সামনেই মরাম-ঢাকা পথ। সেই পথ দিয়ে খানিকটা গেলেই দেওয়ান-ই-খাস। এটাই পুরোনো দরবার-কক্ষ। সাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা এখানে সিংহাসনে বসে শুনতেন বাদশা নিজেই।

আরো যে যে প্রাসাদ ও কক্ষ অবশ্য দ্রষ্টব্য তাহলো:

দেওয়ান-ই-খাস: নির্বাচিত দর্শনপ্রার্থী এবং সভাসদগণের সঙ্গে বাদশা নিজেই দেখা করতেন। দেয়ালে ফারসিতে লেখা একটা বয়েৎ, যার অর্থ দাঁড়ায় মোটামুটি এরকম—

'শান্তিস্বর্গ যদি এ-ভুবন থাকে
তবে তা এখানে, তবে তা এখানে, তবে তা এখানে।'

রংমহল: এই কক্ষের দেয়ালজোড়া সুন্দর ছবি। চালচিত্র, রুপোখচিত এবং অলংকৃত। ফোয়ারা থেকে নানা ভঙ্গিতে জল পড়ে নানারঙের পাথরের ওপর দিয়ে।

খাসমহল: এই প্রাসাদটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমেই প্রার্থনাগৃহ, তারপর সারবন্দী শোবার ঘর, শেষে বৈঠকখানা। শোবার ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে দেয়াললিপিতে জানা যায়, লালকেল্লা তৈরি শুরু হয়েছিলো ১৬৩৯ সালে, শেষ হয়েছে ১৬৪৮ সালে। ৫ মিলিয়ন খরচ হয়েছে।

হামাম: রাজকীয় স্নানঘর। মোগলরাজপরিবার স্নান-গোশলের ব্যাপারে খুবই বিলাসী ছিলো। একটা ঘর, এমনভাবে তৈরি যেখানে বাষ্প-স্নান করা যেতো।

মোতি মসজিদ: মুক্তোর তৈরি মসজিদ। জুম্মা মসজিদে না গিয়ে বাদশা আওরঙ্গজেব এখানেই দিনে পাঁচবার নামাজ সারতেন। ঢুকতে জনপিছু ৫০ পয়সা। সকাল-সন্ধে খোলা।

আলো-আওয়াজের খেলা : লালকেল্লা কেন্দ্র করে রাজারাজড়া-দের কাহিনী, দিল্লির নানা উত্থান-পতন গল্পচ্ছলে সুন্দরভাবে দেখানো হয় নিয়মিত। বর্ষাকাল ছাড়া। টিকিট মাথাপিছু ২.৫০ এবং ৫ টাকা। দিনে দুবার দেখানো হয়। সংলাপ একবার হিন্দিতে, একবার ইংরিজিতে।

আসন সংরক্ষণের জন্যে :

আই টি ডি সি
এল ব্লক, কনট প্লেস
টেলি ৪২৩৩৬, ৪০৯৮২

লালকেল্লার নহবৎখানাতেও টিকিট পাওয়া যায় :

ভারত সরকারের পর্যটন দফতর
৮৮ জনপথ

এছাড়া, অশোকা আর জনপথ হোটেলে আগাম বুকিং। চলতি প্রদর্শনীর জন্যে দরজার পাশে কাউনটারে।

সফদরজং-এর সমাধি

৪.৮ কিমি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে একটা বাড়ির মাঝখানে এই সমাধি। চারিদিকে বাগান। সফদরজং-এর ছেলে নবাব শিয়া-উদ-দৌলা তাঁর বাবার স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্মারক তৈরি করান। ১৭৫৩-৫৪ সাল। সফদরজং ছিলেন মোগল বাদশা মহম্মদ শাহের উজিরে আজম। এখানে ঢুকতে গেলেও মাথা-পিছু ৫০ পয়সা। খোলা থাকে সকাল-সন্ধে।

সামসিতালাও আর জাহাজমহল

১৪.৮ কিমি। খাঁজ-কাটা বিশালবাগানে, মেহেরাউলির কাছে এই জলাধার তৈরি হয়েছিলেন ১২৩০ সালে। বাঁধানো ছাতার নিচে কোন এক সন্তের পায়ের অস্পষ্ট ছাপা। কাছেই আম্রকুঞ্জ। চমৎকার পিকনিক স্পট।

সামসিতলাও-এ ভাসমান জাহাজমহল। সত্যিকার জাহাজের মতো ভাসছে।

শান্তিবন

৪'৪ কিমি। পণ্ডিত জওহরলালের মরদেহ ১৯৬৪ সালের মে মাসে এখানে দাহ করা হয়। চারিদিকে সবুজ গাছপালা। প্রকৃত শান্তিকুঞ্জের আদল সর্বত্র।

সোনেরি মসজিদ

৬'৫ কিমি। গম্বুজ-রীতিতে তৈরি মসজিদ। ১৭৭২ সালে জনৈক অভিজাত ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেন। এর ছাদে চড়েই নাদির শা তরোয়াল তুলে তামাম দিল্লির মানুষজনকে খুন করার নির্দেশ দেন।

তিনমূর্তি ভবন

৪ কিমি। বৃটিশ আমলে এটা ছিলো বৃটিশ-ভারতীয় কমানডার-ইন-চিফের বাসগৃহ। পরে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৪৮ থেকে এখানে বসবাস শুরু করেন। এখন এখানে নেহরু-স্মৃতির যাবতীয় কিছু সংরক্ষিত—যাদুঘর। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা।

এখানেও আবার 'আওয়াজ ও আলোর' প্রদর্শনী, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর। বর্ষার সময়টুকু ছাড়া। টিকিটের দাম ৩ টাকা, ১ টাকা। তিনমূর্তি ভবনে এবং সেনট্রাল কটেজ ইনডাস্ট্রিজ এমপোরিয়ামে টিকিট পাওয়া যায়।

তুঘলক বাগ

১৯'২ কি মি। কুতুবমিনার-বদরপুর সড়কে পড়বে সেই বিশাল দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমি ও তৃতীয় দিল্লির ধ্বংসাবশেষ। দূর থেকে এ আপনার দৃষ্টি কেড়ে নেবে। তৃণভূমির মধ্যিখানে ১৩ দরওয়াজাযুক্ত বিশাল দুর্গ। গল্পে আছে, সন্ত নিজামুদ্দিন যে সব

মজুরমিস্তিরিদের পুষ্করিণী গড়ার কাজে লাগিয়েছিলেন, গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তাদের জোর করে ডেকে এনে এই দুর্গ আর শহর বানাতে বাধ্য করেছিলেন। নিজামুদ্দিন অভিশাপ দেন, এই দুর্গে, এই শহরে শুধুই গরুছাগল চরাবে রাখাল।

বিজয়ঘাট

৪'৪ কিমি। এখানে ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দাহ হয়।

চিড়িয়াখানা

গরমকালে ৮ থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে
শীতে ৯ ,, ,, ৫টা ,, ,, ,,

প্রবেশমূল্য : বড়দের ৫০ পয়সা, ছোটদের ১০ পয়সা। ৫ বছর বয়েসের কম ছেলেমেয়েদের প্রবেশমূল্য লাগে না।

দিললি থেকে যে সব জায়গায় বেড়াতে যাওয়া যায়

(১) **বাধকল** হ্রদ। কৃত্রিম এই হ্রদটি চড়ুইভাতির পক্ষে প্রকৃষ্ট জায়গা। সুইমিং পুল আছে। দিললি-মথুরা হাইওয়ে ফরিদাবাদ থেকে বাঁক নিয়ে ৩২ কি মি যেতে হবে।

থাকার জায়গা : ট্যুরিস্ট বাংলো
এসি ডবল ৩৫'০০ স্যুইট ৬০'০০
পানশলা ভোজনশালা লাগোয়া
ট্যুরিস্ট হাউস
(দুঘরা) ১১০'০০

রিজার্ভেশন : প্রজেক্ট অফিসার, হরিয়ানা গভঃ
চন্দ্রলোক বিল্ডিংস, ৩৬ জনপথ
টেল ৪০৪৭০ অথবা
প্রজেক্ট অফিসার, বাধকল হ্রদ
টেল ৮১-২২০২

মাছ ধরার জন্যে পারমিট ঐ প্রজেক্ট অফিসেই পাওয়া যাবে।

(২) বল্লভগড়: দিললি—আগ্রা রোডের উপর ৩৬'৮ কি.মি.র মাথায় পড়ে। হ্রদে মাছ ধরার জন্যেই বল্লভগড় বিখ্যাত।

থাকার জায়গা: রেস্ট হাউস
'এ' ক্লাস ১৪'০০
'বি' " ১০'০০
'সি' " ৭'০০

জিনিসপত্র কিনে দিলে খাবার তৈরি করে দেবে।

রিজার্ভেশন: ডেপুটি কমিশনারের জেনারেল এ্যাসিস্ট্যান্ট গুরগাঁও। টেলি ৩০২

দশানা

জলপূর্ণ সুন্দর খালের ধারে আম্রকুঞ্জ। খালের জলে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম জলপ্রপাত। দিললি-গাজিয়াবাদ রোডে ৪০ কিলোমিটার পথ গিয়ে, গাজিয়াবাদের আগেই বাঁদিকে বেঁকে হাপুর-লখনউ রাস্তা ধরতে হবে। সেখান থেকে ক্যানালের রাস্তা ধরে দেড় কি. মি.। এই ক্যানাল রোড ধরে যেতে—একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, ইরিগেশন, বুলান্দশহর-এর কাছ থেকে অনুমতি জোগাড় করতে হবে। রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন বন্ধ।

থাকার জায়গা:

ক্যানাল পর্যবেক্ষণ বাংলো
সরকারি কর্মচারীদের জন্যে দিনে ১ টাকা
অন্যান্যের জন্যে ৩ টাকা
জিনিসপত্র যোগাড় করে দিলে বাংলোর চৌকিদার রেঁধে বেড়ে দেবে।

রিজার্ভেশন: একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, ইরিগেশন ডিভিশন, বুলন্দশহর, টেলি ২৫।

ধানশা

গ্রাম্যপরিবেশে অতি সুন্দর বেড়াবার জায়গা। দিললি থেকে উইকএনডে বহু লোক যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিশ্রামাগার আছে। দিললি-নজফগড় সড়কের উপর ৪১ কি. মি.।

থাকার জায়গা : মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউস

ডবল এসি ২০ টাকা। ডবল এসি নয় ১৫ টাকা।

খাবার জিনিস যোগাড় করে দিলে চৌকিদার তৈরি করে দেবে।

রিজার্ভেশন : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, দিললি অ্যাড-মিনিষ্ট্রেশন হিন্দু কলেজ বিলডিংস কাশ্মীর গেট, টেলি ২২৭১২০

হিনডন

পিকনিক এবং মাছ ধরার জায়গা হিসাবে বিখ্যাত। ১৯.৩ কি. মি. দিললি-হিনডন রোডের উপর। বাঁধে মাছ ধরার জন্যে অনুমতি নিতে হবে একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, আপার আগ্রা ক্যানাল ডিভিসন, মথুরা।

অনুমতি ছাড়া গাড়ি হিনডন ব্রিজের কাছে রাখা যাবে। মাছ ধরার পারমিট পাওয়া যাবে টেলিগ্রাফের হেড সিগনালম্যানের কাছ থেকে।

ময়ুর বাঁধ

সাপুড়েদের গাঁ। দিললি-আগ্রা সড়কে জৈতপুর গ্রামের ঠিক পেছনটায়। খুব ভোরে বা ভর সন্ধেবেলা এই গাঁয়ে এসে সাপুড়েদের সাপ ধরা দেখা যেতে পারে। শীত বাদ।

ওখলা

যমুনা খালের কাছে অন্যতম পিকনিক স্পট। ইয়টিং করা যায়। মাছ ধরা যায়।

দিললি-মথুরা সড়কে ১১.৮ কি. মি.।

মাছ ধরার অনুমতি নিতে হলে এ্যাসিষ্ট্যান্ট ওয়ারডেন, ফিসারিজ, ওখলা-য় লিখতে হবে।

সংরক্ষিত দিকে ৩·৫০ টিকিট। খোলা পুকুরে ২·২৫ পয়সা।

ইয়টিং-এর জন্যে : ডিফেনস সারভিসেস সোলিং-ক্লাব, টেলি ৬৩০৮৬৩।

চার্জ ১ম ঘণ্টা ৫ টাকা, পরের ঘণ্টায় ৩ টাকা।

সোমবার বন্ধ। বর্ষাকালে বন্ধ।

থাকার জায়গা : ইরিগেশন রেস্ট হাউস, টেলি ৬৩০৮১৩
ডবল ৪·৭৫ (এপ্রিল—মার্চ অক্টোবর)
৩·৫০ (অক্টোবর—মার্চ)

ইরিগেশন পর্যবেক্ষণ বাংলো

ঘর পিছু ৪৪ পয়সা। বিছানা নেই। খাবার পাওয়া যায়।

রিজার্ভেশন : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, আপার ডিভিশন ইরিগেশন ডিভিশন, মথুরা। টেলি ১০০
এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার, ইরিগেশন ডিপার্ট, ওখলা।
ফরেস্ট রেস্ট হাউস। টেলি ৬৩১২৫৯
ডবল স্যুইট ২টা
বিজলি শীতে ৩৭ পয়সা দৈনিক
গরমে ৭৫ পয়সা দৈনিক
খাবার এবং বিছানা দুইই পাওয়া যায়।

রিজার্ভেশন : ডি এফ ও, ব্রজভূমি ডিভিশন, আগ্রা
টেলি ৭৩০২৩।

রাজঘাট—নারোরা

পিকনিক স্পট্। আম্রকুঞ্জ। ১৪৯ কি. মি. পথ ভায়া গাজিয়াবাদ-শিকনদরাবাদ-বুলন্দশহর অনুপশহর-ডাবর।

ইনশপেকশন বাংলো ১নং ৫'০০

" " ২—৪ ২'৫০

যোগাড় করে দিলে চৌকিদার রেঁধে দেবে।

রিজার্ভেশন (১৬২) একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার. নারোরা ডিভিশন, আলিগড়। টেলি ১২৪

(৩১৪) এস ডি ও, আলিগড়। টেলি ১৮

সারদানা

স্থাপত্যশিল্প নিদর্শনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য। বেগম সমরুর প্রাসাদও বিশেষ দ্রষ্টব্য। মার্চ এবং নভেম্বরে তীর্থযাত্রীরা আসেন। মীরাট থেকে ২৪ কি. মি.

থাকবার জায়গার জন্যে—রেকটর, আর্চবিশপ সেকরেটারিয়েট, ২৮৩ রুরকী রোড, মীরাট ক্যাণ্ট।

সোহনা

বীরভূমের বক্রেশ্বরে যেমন গরম জলের প্রস্রবন আছে সোহনাতেও তেমনি। বাত-ব্যাধি আরোগ্য হয়ে থাকে। দিললি-গুরগাঁও-আলোয়ার হাইওয়ের উপর—৫৬ কি. মি. দূরত্বে।

ট্যুরিস্ট হাউস (২-ঘরা) এসি ৭৫ টাকা—খাট পিছু।

সাধারণ দুঘরা ৪০ টাকা। খাবার পাওয়া যায়।

রিজার্ভেশন: প্রজেক্ট অফিসার, হরিয়ানা সরকার, চন্দ্রলোক বিলডিংস, ৩৬ জনপথ, হরিয়ানা। টেলি ৪০৪৭০।

সুলতানপুর

জলা পাখির পক্ষিনিবাস। ৪২ কি. মি.। যেতে হবে ভায়া গুরগাঁও টাউনশিপ এবং ফররুখনগর।

ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, এসি ডবল ৪৫'০০ রান্নার সরঞ্জাম আছে।

রিজার্ভেশন: প্রজেক্ট অফিসার, হরিয়ানা সরকার, চন্দ্রলোক বিলডিংস, ৩৬ জনপথ।

সুরয কুণ্ড

বলা হয় খৃষ্টপূর্ব ১০২০-তে তৈরি। এই কুণ্ডের পাশে ছিলো সূর্যমন্দির এবং সংলগ্ন বসতি। এখন জলের কোন চিহ্ন নেই। কুণ্ডের বাঁধানো কাঠামো থিয়েটারের বিশিষ্ট ষ্টেজের মতন পড়ে আছে। গ্রাম্যপরিবেশ মনোমুগ্ধকর। বিশেষ করে মে মাসে যখন জঙ্গলে গাছে গাছে ফুলের আগুন জ্বলে তখন। বর্ষার ঠিক পরেই এখানে একটি বাৎসরিক মেলা বসে।

কুতুব-তুঘলকাবাদ সড়ক ছেড়ে ১৭·৭ কি. মি. গেলেই ঐতিহাসিক সুরয কুণ্ড। ভালো একটি রেস্তোরাঁও আছে।

দিল্লিতে সপ্তাহখানেক থাকার কথা। দিন গড়াতে-গড়াতে পৌঁছুলো গিয়ে দশে। এর পর, সর্ত-অনুযায়ী আগ্রা যাবার কথা। কয় বন্ধু মিলে রাতে বাক্স-পেটরা ঘাঁটাঘাঁটি করা হলো। কাঁধ ব্যাগে যে যা হাতের কাছে পাচ্ছে—টাকাটা সিকিটা তার মধ্যে ভরে দিচ্ছে। ফেরার টিকিট আগে থেকেই কন্না ছিলো। সুতরাং একটা সময় কাঁধ-ব্যাগের মুখ খুলে টাকাপয়সা বিছানার ওপর। গোনাগাথার পর মোটামুটি দেখা গেলো কালই যাওয়া যেতে পারে এবং তার জন্যে কোনো কোনো বন্ধুর আর ব্যাংকে যাবার দরকার হবে না। সুতরাং চলো আগ্রার দিকে। শুনে আসি শ্বেতপাথরের কান্না। দেখে আসি শ্বেতপাথরে রক্তপাত।

[অন্যান্য বিস্তৃত খবর 'নির্দেশিকা' পরিচ্ছেদে]

শ্বেতপাথরে রক্তপাত/তাজমহল

শ্বেতপাথরের রক্তপাত যদি কোনকিছুকে সৃষ্টির মহান আতিশয্যে উন্নীত করে থাকে, তা ঐ তাজমহল। মানুষের ভালোবাসা পৃথিবীতে যদি কোন অবিনশ্বরতা রেখে গিয়ে থাকে, তারও নাম ঐ তাজমহল। মানুষ এখানে মানুষের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে অনেক উপরে, মেঘলোকের সিং-দরজায়। সেই কোন ছোটবেলা থেকে, সকলের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটি সাধ-ই লালিত হয়ে থাকে তাজমহল দেখার, জীবনে অন্যসমস্ত দেখার চেয়ে বড় দেখা—আমারও স্বপ্নের মধ্যে সেই সাধ ছিলো। কবে চরিতার্থ হবে, জানতুম না। বড় হওয়া মাত্র, ভেবে রেখেছিলাম, সুযোগ পেলেই, তাজমহল দেখতে ছুটবো। কতলোকে কতভাবে যাকে দেখেছে, যুগে যুগে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত থেকে শুধুমাত্র তাজ দেখার জন্যেই প্রাণপাত করে হাজার মাইল উড়ে এসেছে বিদেশি মানুষ। পূর্ণিমারাতে তাজমহল দেখা এক অসহ্য অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা যার না হয়েছে, তার জীবনে একটি শূন্যতা চিরদিনের মতো রয়ে গেলো ধরে নিতে হবে। জ্যোৎস্নায় তাজরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বর্ণনা করা যায় না কী অসম্ভব সুকুমার শিল্পবোধ এবং নিপুণ কুশলতায় তৈরি এই ভারতীয় স্মৃতিমন্দির। কবির মতো সৃষ্টিশীল সুন্দরের প্রেমের পূজারী এই সম্রাট শাজাহানের হৃদয়-মন্থনজাত তাজমহল শুধুই সমাধি বা স্মৃতিমন্দির নয়, স্থাপত্য শিল্পে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কতো কবির প্রেরণা, কতো প্রেমিকের যন্ত্রণার সুখ, কতো বিবাগীর শৃঙ্খলবন্ধন হয়ে চিরঅম্লান বিরাজ করছে। সময়ের ক্ষয়ের হাত তাকে ছুঁতে পারে না। মানুষের মৃত্যু হয়। মানুষের স্মৃতির

কোনো মৃত্যু নেই। কালস্রোতে জীবন যৌবন ধনমান সবই ভেসে যায়—যায় না শুধু শুভ্র সমুজ্জল তাজমহল। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই যাকে বলেছেন, নবমেঘদূত।

তাজমহল আগ্রায়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহাভারতে আগ্রার উল্লেখ আছে। সেখানে অবশ্য, তার নাম 'অগ্রবন'। যার সংস্কৃতভাষায় অর্থ হলো স্বর্গ। ২য় খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের ভূগোলবিদ চলেমির মানচিত্রে আগ্রার উল্লেখ আছে। এতো গেলো বহুকাল আগের কথা। আগ্রার তৎপরবর্তী বিশিষ্টতা মোগল যুগে। তাজমহল ছাড়া দর্শনীয় হলো আগ্রা দুর্গ, ইতমদুদৌলার সমাধি প্রভৃতি।

দেখার জায়গা

আগ্রার দুর্গ

আকবর বাদশা ১৫৬৫ খৃঃ যমুনাতীরে এটি তৈরি করেন। অনেক প্রাসাদ এই দুর্গের মধ্যে। মোতি মসজিদটিও অন্যতম দ্রষ্টব্য।

সকাল থেকে সন্ধে খোলা। ঢুকতে মাথাপিছু দু টাকা। শহর থেকে ৩ কিমি।

দয়ালবাগ

৮ কিমি। হিন্দুধর্মের রাধা স্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান দফতর। শ্বেতপাথরের একটি বিশাল মন্দির তৈরি হচ্ছে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা। প্রবেশ মূল্য নেই।

ফতেপুর সিক্রি

৩৭ কিমি। ছেড়ে আসা, পরিত্যক্ত শহর। ১৫৬৯ খৃঃ আকবর তৈরি করেন। প্রাক্তন মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানি।

সকাল থেকে সন্ধে খোলা।

২ টাকা মাথাপিছু প্রবেশমূল্য।

গাড়িতে মাথাপিছু ২৫ পয়সা টোল ট্যাক্স।

ইত্‌মদ্‌দৌলার কবর

৬·২ কিমি। বাবা গিয়াসুদ্দিন বেগের স্মৃতিরক্ষার্থে নূরজাহান ১৬২২ থেকে ১৬২৮ খৃঃ তৈরি করেন। নুরজাহানের মায়ের কবরও এখানে। তাজের আগে তৈরি।

সকাল থেকে সন্ধে খোলা।

২ টাকা মাথাপিছু প্রবেশমূল্য।

রামবাগ

১০ কি মি। মোগল বাগানের প্রাক্তন এবং প্রথম দিককার নিদর্শন। বাবর ১৫২৬ খৃঃ তৈরি শুরু করেন। প্রবেশমূল্য নেই।

সেকেন্দ্রা (আকবরের সমাধি)

১০ কিমি। আকবর শুরু করেছিলেন। শেষ করেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর। হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির মিশ্রণে তৈরি। ২ টাকা প্রবেশ মূল্য।

তাজমহল

৩ কিমি। ১৬৫৩ খৃঃ তৈরি শেষ। সকাল থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত। পূর্ণিমার দিন এবং আগে-পিছের চার চার আটদিন মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা। দু টাকা প্রবেশমূল্য। ১৫ বছরের নিচে কারুর প্রবেশমূল্য লাগে না। শুক্রবার কোনো প্রবেশমূল্য লাগে না। বন্ধ হবার আধঘণ্টা আগে পর্যন্ত টিকিট বিক্রি হয়। ৮ এম এম-এর বেশি মুভি ক্যামেরায় ছবি তোলা নিষেধ। আগাম অনুমতিপত্র নেবার জন্যে ডিরেকটর জেনারেল, আরকিওলজিক্যাল সারভে অফ ইনডিয়া, জনপথ, নয়াদিললিতে লিখতে হবে।

আগ্রা থেকে কোথায় যাবেন

কেইথাম লেক

২৩ কিমি। ২.৫ বর্গমাইল হ্রদ চারদিক ঘিরে। মাঝখানে সুরদাস রিজার্ভ ফরেস্ট। ৬৪০ একর। হ্রদে নানাধরনের মাছ আর জলপাখি। মাছ ধরার জন্যে অনুমতি পাওয়া যাবে: একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, লোয়ার ডিভিশন, আগ্রা ক্যানাল। দি মল আগ্রা। টেলি ৭২২১৫। চারজ ২ টাকা দিনে। বাস রুনকাটা পর্যন্ত যাবে। আগ্রা-দিললি জাতীয় সড়ক ধরে যেতে হবে। লেক রুনকাটা থেকে ৩ কিমি।

কেওলাদেও ঘানা পাখিরালয়

৫৪ কিমি। ভারতে যতগুলি জলপাখির জন্যে পাখিরালয় আছে এটি তার অন্যতম। ৩০ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই পক্ষিনিবাস। বিশেষ বিশেষ পাখির নাম! করমোরানট, ডার্টার, সপুনবিল, ইগ্রো, সাদা ইবিশ এবং স্টর্ক। শীতে সাইবেরিয়া থেকে যাযাবর পাখির দল এখানে আসে। অকটোবর থেকে ফেবরুয়ারি সীজন। ভারতপুর বাসস্ট্যানড থেকে ৪ কিমি। আগ্রা ভারতপুর নিয়মিত বাসসার্ভিস আছে। স্যাঙ্কচুয়ারিতে ঢোকার আগে ওয়ার্ডেনের কাছ থেকে পারমিট নিতে হবে।

মথুরা

আগ্রা থেকে নিয়মিত বাস। কৃষ্ণের সেই মথুরানগরী। হিন্দুতীর্থ হিসাবে বিখ্যাত। ৫৪ কিমি দূর।

বনবিহার ওয়াইলড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি

৫৬ কিমি। মূল আয়তন ৫২ বর্গ কিমি। বাঘ, সম্বর, চিতল, ব্ল্যাকবাক, নীলগাই আর শ্লথ ভাল্লুক। আগ্রা থেকে পর্যটকগণকে গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। সীজন। নভেম্বর থেকে জুন মাস।

বৃন্দাবন

৬৩ কিমি। ষোড়শ আর উনবিংশ শতাব্দীর বহু সুন্দর সুন্দর সব মন্দির আছে। হিন্দুতীর্থ হিসাবে বিখ্যাত। কৃষ্ণ এখানে শৈশবকাল কাটিয়েছেন। নিয়মিত বাস। ট্রেন আছে।

আগ্রা থেকে কোন জায়গা কতদূর

	কিমি	মাইল
ভরতপুর	৫৪	৩৪
দিল্লি	২০৪	১২৭
গোয়ালিয়র	১১৯	৭৪
জয়পুর	২৩১	১৪৭
খাজুরাহো	৩৯৫	২২২
মথুরা	৫৪	৩৪
নৈনিতাল	৩৭৬	২৩৪

মথুরা নগরী

যমুনার পশ্চিমতীরে মথুরা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলির সাধারণভাবে নাম ব্রিজভূমি বা ব্রজভূমি। হিন্দুদের পুণ্য তীর্থ। খৃঃ পূর্ব ১৫০০-তে কৃষ্ণ এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই উপলক্ষে ব্রজভূমি পুণ্যভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই মথুরানগরী সাংস্কৃতিককেন্দ্র। অশোকের সময়ে স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে শিল্পোৎকর্ষে ভারতের সেরা। পূর্বসাম্রাজ্যের রাজধানি করেছিলেন কৃষ্ণ মথুরাকে। খৃষ্টপূর্ব ১০০ থেকে ৫৭ পর্যন্ত শকের রাজত্বকালে মথুরা ছিলো শক রাজাদের রাজধানি। অনেক স্তূপ আর বিহার তৈরি করা হয়। কুষাণ রাজত্বকালে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে ওঠে মথুরা। মথুরা বৌদ্ধধর্মের প্রধান পীঠস্থান হয় ওঠে গুপ্তযুগে। বর্তমানে ঐতিহাসিক এবং ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের জন্যে মথুরা বিখ্যাত। মথুরার রাসলীলা দেখতে

বহুদূর দেশ থেকে বিদেশিরা এখানে আসেন। সারাবছরই কোন না কোন উৎসব লেগে থাকে। ব্রজনাচ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকগানের জন্যে মথুরার নামডাক।

যে সব জায়গা অবশ্য দ্রষ্টব্য

গাড়িতে একদিনের মধ্যে যে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ঘুরে দেখা সম্ভব, বা, পরপর সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি, জুম্মা মসজিদ, বিশ্রাম ঘাট, দ্বারকাধীশ মন্দির, সতী বুরুজ, কংশ কিল্লা, গীতামন্দির।

দ্বারকাধীশ মন্দির

১৯১৪ সালে গোয়ালিয়রের শেঠ গোকুলদাস মথুরা শহরের ঠিক মধ্যখানে এই কৃষ্ণমন্দির তৈরি করেছেন। নাম দেন দ্বারকাধীশ মন্দির। অর্থাৎ দ্বারকার অধীশ্বর। জন্মাষ্টমীর দিন মন্দির আলোকমালায় সাজানো হয়। হোলি দেয়ালি ছাড়াও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে মন্দির সজ্জা হয়। সকাল ৬টা থেকে ১০·৩০। বিকেলে ৪টে থেকে ৬টা।

গীতা মন্দির

মথুরা-বৃন্দাবন রাস্তায় গীতামন্দিরের গায়ে সুন্দর সব ছবি—হিন্দু দেবদেবী এবং পৌরাণিক উপাখ্যানের। গীতাস্তম্ভে পুরো ভাগবতগীতা ফ্রেসকো করা।

জুম্মা মসজিদ

শহরের মাঝখানে এই মসজিদটি আবে-ইন-নবীর খান তৈরি করেন। কেশবদেব মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দিয়ে তৈরি করেন স্থানীয় গভর্ণর ১৬৬১ খৃঃ। মন্দিরটি আসলে কৃষ্ণমন্দির। আওরঙ্গজেব একটি ধ্বংস করেন। এটা সেই জায়গা, জনশ্রুতি এখানে কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম হয়।

কংস কেল্লা

যমুনাতীরে স্বামীঘাটের উত্তরদিকে অম্বরের রাজা মানসিং এই দুইটি তৈরি করেন। এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ এই দুর্গে বাস করতেন। দুর্গের উপরে অবজারভেটরী।

সতীবরুজ

যমুনাতীরে চারতলা এই লাল পাথরের স্তম্ভটি ১৭ মিটার লম্বা। জয়পুরের বিহারীমলের ছেলে তাঁর মায়ের স্মৃতিতে এটি তৈরি করেন ১৫৭০ খৃঃ। মা সতীদাহে জীবন আহুতিদেন বলেই এর নাম সতী বুরুজ।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি

কাটরা কেশবদেবে প্রভু কৃষ্ণের জন্মভূমি। এই জায়গার পাশে আওরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠিত লাল পাথরের তৈরি মসজিদ। এখানে শোনা যায়, ভগবান কৃষ্ণের মন্দির ছিলো—তা ধ্বংস করেন আওরঙ্গজেব ১৬৬৯ খৃঃ।

বিশ্রামঘাট

মথুরার অত্যাচারী রাজা কংস নিধন শেষে কৃষ্ণ এই স্নানের ঘাটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন। জনশ্রুতি এই। সকালে-সন্ধ্যায় আরতিদৃশ্য অপূর্ব।

যাদুঘর

সরকারি যাদুঘর। ড্যামপিয়ার নগর, টেলি ৯২। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী থেকে ১২০০ খৃঃ-এর নগর নিদর্শন ভাস্কর্য, টেরাকোটা, ব্রোনজের টাকাকড়ি প্রভৃতি নানান জিনিষ সুরক্ষিত। মৌর্য, সুঙ্গ, কুষান এবং গুপ্ত যুগের মূল্যবান নিদর্শনে যাদুঘর ভর্তি। ছুটির দিন আর সোমবার বাদে সবদিন খোলা।

কিছু কিছু নিদর্শনের ছবি যাদুঘরের অধ্যক্ষের কাছ থেকে ২ টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। গাইড আছে।

এখান থেকে কোথায় যাওয়া যাবে

বলদেও : ২১ কিমি। কৃষ্ণের বড়ভাই বলদেবের (বা বলরামের) বিখ্যাত মন্দির।

বারথ : ৪৭ কিমি। রাধার জন্মভূমি।

ভরতপুর : ৩৬ কিমি। কেওলাদেও ঘানা পক্ষিনিবাস। ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং নিকটবর্তী দুর্গ দ্রষ্টব্য।

দীগ : ৩৪ কিমি। দুর্গ, বাগিচা এবং পুরানো প্রাসাদের জন্যে বিখ্যাত। ভরতপুর এবং মথুরা থেকে সমান দূরে।

গোকুল : ১০ কিমি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপনে লালিত-পালিত হন। জন্মাষ্টমীর দিন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসব। অন্নকূট উৎসবও অন্যতম প্রধান উৎসব। সবচেয়ে বড় মন্দির গোকুলনাথজীর।

গোবর্ধন : ২৬ কিমি। ইন্দ্র বৃষ্টিপাত ঘটালে এই গিরি গোবর্দ্ধনকে আঙুলে তুলে রেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের মানুষজনকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে। সাতদিন সাতরাত আঙুলে তুলে রেখেছিলেন এই গোবর্দ্ধনকে। জনশ্রুতি এই।

মহাবন : ১১ কিমি। এখানে দোলায় শ্রীকৃষ্ণ দোল খেতেন বলে সাধারণের বিশ্বাস।

নন্দগাঁ : ৫৬ কিমি। পালক পিতা নন্দের বাড়ি বলে বিশ্বাস। দ্বাদশ শতাব্দীতে মন্দির তৈরি হয়েছিল।

শঙ্খ : ৩২ কিমি। জারমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খননকাজে ব্যস্ত। টেরাকোটা এবং নানান ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মথুরার সরকারি যাদুঘরের অধ্যক্ষকে চিঠি দিলে তিনি খোঁড়াখুঁড়ির কাজ যেখানে চলছে, সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারেন।

বৃন্দাবন

১০ কিমি। কৃষ্ণজীবন ও কৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে জড়িত এই বৃন্দাবন। হিন্দুদের অতিপবিত্র তীর্থস্থান। বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে গোবিন্দদেব (১৫৯০ খৃঃ) রঙ্গজী (১৮৫১ খৃঃ) রাধাবল্লভ (১৫২৬ খৃঃ) এবং শাহজী (১৮৭৬ খৃঃ)।

বৃন্দাবনের সব মন্দিরের মূর্তিদর্শনের সময় সকাল ৮—১১·০০
সন্ধ্যে ৭—১০·০০ রাত

মথুরা থেকে বৃন্দাবন নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

থাকার জায়গা

(১) জয়পুরিয়াভবন, গোবর্দ্ধন দরওয়াজা, টেলি ৮৮
ডবল ৬ টাকা—৮ টাকা
এসি চার্জ ২০ টাকা দিনে

সাতদিনের বেশি থাকা যাবে না। যে আগে যাবে সেই ভিত্তিতে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে।

(২) কৃষ্ণ বলরাম আন্তর্জাতিক অতিথিশালা
রামান রেতি। টেলি ১৭৮
থাকার জায়গা। একজনের ১৫ টাকা
দুজনের ২০

(৩) জীবনবল্লভ মন্দির। বেহারীপুরা। টেলি ৪২
ডবল ৪—৫ টাকা (বাথরুম সবার সঙ্গে)
এছাড়া, অনেক ধর্মশালা আছে।

হরিদ্বার বা হরদোয়ার

উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় সমুদ্রপিঠ থেকে ২৯৪ মিটার উঁচুতে হরিদ্বার বা হরদোয়ার। কেউ কেউ একে হরদুয়ারও বলেন। প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের পাদদেশে এবং গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরে। লোক সংখ্যা পৌনে একলাখ। আয়তন ৭'৫ বর্গ কিলোমিটার। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। প্রাচীনকালে এরই নাম ছিল মায়াপুরী। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে এর উল্লেখ আছে। হরিদ্বারের যে কতো নাম তার ঠিক নেই। অনেকে একে গঙ্গাদ্বার বা তপোবনও বলে। পুরনো আমলের নাম কপিলাস্থান। পুরাণ কথায় বলে, রাজা ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের ভস্ম থেকে পুনর্জীবিত করেন কপিল মুনিকে ধ্যানে তুষ্ট করে।

১২ বছর পর পর যে চারটি জায়গায় কুম্ভমেলা হয়, হরিদ্বার তার মধ্যে একটি। পাপক্ষলনের জন্য লক্ষ লক্ষ হিন্দু কুম্ভস্নান করেন।

কুম্ভের জন্ম হিন্দুসংস্কৃতির সমসাময়িক। পুরাণে আছে, সমুদ্র মন্থনে অমৃতকলস ওঠার পর তার দখল নিয়ে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে-সময় দেবতাদের চেয়ে অসুরদের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিলো। অমৃতকলস অসুররা যাতে নিতে না পারে, সেজন্য বৃহস্পতি, সূর্য, চন্দ্র এবং শনির উপর তা লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব বর্তায়। চার দেবতা অমৃতকলস নিয়ে পালাতে আরম্ভ করে। অসুররা একথা জেনে ঐ চারদেবতাকে তাড়া করে। ১২ দিন, ১২ রাত্রি পশ্চাদ্ধাবনের পর দেবতারা অমৃতকলস হরিদ্বার প্রয়াগ, উজ্জয়িনী আর রাসিকে রাখে। তাই কুম্ভমেলা। মতান্তরে, দেবতা-অসুরের লড়াই-এ অমৃতকলস ভেঙে উপরোক্ত চার জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

দেখার জায়গা

(১) হর-কি প্যারী : হর-কি প্যারী বা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলে সবচেয়ে বেশি পুণ্য হয়। এছাড়া, পর্যটকদের কাছে হরিচরণ মন্দির, রাজা মানসিং কি ছত্রী এবং বিড়লা মিনার প্রধান আকর্ষণ। সন্ধ্যায় গঙ্গারতি একটা দেখার মতো জিনিস। এখানে রাজা ভর্তৃহরি তপস্যা করেছিলেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সহোদর ভর্তৃহরির স্মৃতিতে পুষ্করিণী এবং সিঁড়ি তৈরি করে দেন।

(২) ক্যানাস সেনটিনারি ব্রিজ : হর-কি-প্যারীর কাছে খালের উপরকার ব্রিজ থেকে সবগুলি ঘাট সুন্দরভাবে দেখা যায়। দৃশ্য মনোহর।

(৩) ভীমগোদা ট্যাংক : মধ্যমপাণ্ডব ভীমের নামে নাম। বলা হয়, ভীম গোড়ালি দিয়ে মাটিতে এমন ঘা মারলেন যে, দাপটে পুকুর হয়ে গেলো।

(৪) ভীমগোদা ক্যানাল হেড ওয়ার্কস।

(৫) সাধু বেলা।

(৬) পরমার্থ আশ্রম।

(৭) সপ্তঋষি আশ্রম এবং সপ্ত সরোবর।

(৮) ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস লিঃ। রাণীপুরে অবস্থিত।

(৯) আর্য বাণপ্রস্থ আশ্রম, জাওয়ালাপুর। অবসর নিয়ে এই আশ্রমে বাস করতে যান অনেকেই।

(১০) গুরুকুল কাংরি বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ভারতের একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান। এর সংলগ্ন বেদমন্দির, যাদুঘর এবং ঔষধালয়।

(১১) দক্ষমহাদেব মন্দির এবং সতীকুণ্ড : কনখল।
এখানেই সতীপিতা দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ করেন এবং শিবকে নেমন্তন্ন করেন না। স্বামীকে নেমতন্ন না

করায় অপমানিত সতী যজ্ঞকুণ্ডে জীবন বিসর্জন করেন। হরিদ্বারের কাছে যে পাঁচটি তীর্থ আছে, কনখল তার অন্যতম।

(১২) রামকৃষ্ণ মিশন।

(১৩) মনসাদেবী মন্দির।

(১৪) চণ্ডীদেবী মন্দির।

গঙ্গা পার হয়ে ৩ কি.মি. হেঁটে গেলে নীল পর্বত। তার উপরেই চণ্ডীদেবী মন্দির। এরই কাছে গৌরীশংকর, নীলেশ্বর মহাদেব আর অঞ্জনা দেবীর মন্দির।

যে মন্দিরগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্য

১।	গোরখনাথ মন্দির এবং গুহা	আপার রোড, হরিদ্বার
২।	আইআপ্পা মন্দির	গুজরাট ভবনের কাছে
৩।	বিল্বকেশ্বর মন্দির	আই ডি হাসপাতালের কাছে
৪।	কালভৈরব মন্দির	"
৫।	গীতাভবন	ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কাছে
৬।	মায়াদেবা মন্দির	"
৭।	ভৈরব মন্দির	ভৈরব আখড়া
৮।	ভোলাগিরি আশ্রম	গীতাভবনের কাছে
৯।	পশুপতি মহাদেবের শ্রবণনাথ মন্দির	মোতিবাজার
১০।	মনোকামনা সিদ্ধ হনুমান মন্দির	গণেশঘাট, মায়াপুর
১১।	" "	অবধূত মণ্ডল আশ্রম/কনখল জাওয়ালাপুর রাস্তার উপর
১২।	" "	শ্রবণনাথ ঘাট, হরিদ্বার
১৩।	মানবকল্যাণ আশ্রম	কনখল রোড
১৪।	নারায়ণী শীলা	মায়াপুর

বিভিন্ন উৎসব ও মেলা

সম্বৎসর/মারচ-এপরিল	শারদপূর্ণিমা/অকটোবর-নভেম্বর
রামনবমী/এপরিল	দেয়ালি/ " "
বৈশাখী/ এপরিল	কার্তিক পূর্ণিমা ও
গঙ্গাদশেরা/মে-জুন	গুরুনানকের জন্মদিন " "
নাগপঞ্চমী/আগস্ট	মকরসংক্রান্তি/জানুয়ারী
জন্মাষ্টমী/আগস্ট-সেপটেম্বর	বসন্ত পঞ্চমী/জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
মেলা মুঘল/সেপটেম্বর	শিবরাত্রি/ফেব্রুয়ারি-মারচ
শকুমবারি দেবী মেলা/ অকটোবর	বারুণী/মারচ-এপরিল
	কুম্ভমেলা/১২ বছর বাদে

হরিদ্বারের সঙ্গে রেল যোগাযোগ সমস্ত শহরের কিন্তু বিমান যোগাযোগ নেই। ছোট্ট একটি বিমান নামার জায়গা আছে ৮৮ কি.মি. দূরে, শহরটির নাম সরসভা। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ চমৎকার।

শহরের মধ্যে বাস চলাচল নিয়মিত। এছাড়া ট্যাক্সি আছে, টাঙ্গা, রিকশা সহজেই পাওয়া যায়।

থাকার জায়গা

(১)	ট্যুরিস্ট বাংলো/বেলওয়ালা	রিজার্ভেশন : ট্যুরিস্ট অফিসার, ট্যুরিস্ট বাংলো, ফোন ৩৭৯ রিজিওনাল ট্যুরিস্ট অফিসার ট্যুরিস্ট ব্যুরো, ফোন ১৯
(২)	ক্যানল ইনশপেকশন হাউস[১,২,৩, এবং ৪] মায়াপুর	এস ডি ও, ক্যানালস, মায়াপুর। ফোন ৩৪
(৩)	লালজীওয়ালা ইনসপেকসন হাউস, লালজীওয়ালা	এস ডি ও, ক্যানালস, মায়াপুর

(৪) জেড, পি ইনশপেকসন
হাউস, বাসট্যাণ্ডের কাছে। জেলা পরিকল্পনা অফিসার

(৫) পি ডবলু ইনশপেকসন
হাউস, ভীমগোদা রোড এস ডি ও, পি ডবলু ডি, হরিদ্বার

(৬) ফরেসট রেসট হাউস, ডি এফ ও, সাহারানপুর ফরেবাট
রাণীগঞ্জ ডিভিশন, দেরাদুন

(৭) রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম,
রেলস্টেশন স্টেশন মাষ্টার, হরিদ্বার

থাকার জায়গা	অবস্থান	ফোন
আনন্দ নিবাস হোটেল	শ্রাবণনাথ ঘাট	৬৭
আর্যনিবাস ট্রাস্ট বিলডিং	মোদি ভবনের কাছে	২৭২
গুরুদেব হোটেল	রেলস্টেশনের কাছে	১০১
গঙ্গা বিলডিং	হর-কি-প্যারী	২৩৫
জয়পুরিয়া হাউস	রামাঘাট	২১৭
জ্ঞান নিকেতন	সুভাষ ঘাট	১৭২
প্যালেশ হোটেল	শ্রাবণনাথ নগর	১৯১
নিউ রয়াল হোটেল	গৌঘাট	৩১৫
শান্তি নিকেতন	হর-কি-প্যারা	১৬৬
উপ্মা হোটেল	সবজি মনডি	৩৫৩
বাসুদেব মাদরাজ হোটেল	রেলস্টেশনের কাছে	৩৫৬
বিদেশ বিক্রম হোটেল	কনখল রোড	৩৭১

হোটেল চারজ বছরের সব সবসময়ই বাড়ে কমে। হরিদ্বারে অসংখ্য ধর্মশালা আছে। থাকার সুবিধা বিস্তর।

হৃষীকেশ

হরিদ্বার থেকে ২৪ কিমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চমৎকার। রেল ও সড়ক যোগাযোগ প্রায় সব বড় শহরের সঙ্গেই আছে। অন্যতম বিশিষ্ট তীর্থস্থান। জনশ্রুতি, ভরত এখানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভরত-মন্দির তৈরি হয় এবং তাকে কেন্দ্র করে শহর।

সমুদ্রপিঠ থেকে :	৩৫৬ মিটার
শীতে পোশাক :	খুব গরম জামা কাপড়
গরমে :	সাধারণ সুতির কাপড়চোপড়
লোকসংখ্যা :	১০৯৩৪

পর্যটকের অবশ্য দ্রষ্টব্য

ভরত মন্দির :	ত্রিবেণী ঘাট।
ঋষিকুণ্ড :	রঘুনাথ মন্দির।
পুষ্কর মন্দির :	শত্রুঘ্ন ঘাট।
লছমনঝুলা ঘাট :	লছমন মন্দির।
স্বর্গ আশ্রম :	গীতা ভবন।
পরমার্থ নিকেতন :	শিবানন্দ আশ্রম।
মহর্ষি মহেশ :	যোগীর আশ্রম।
সত্যনারায়ণ মন্দির :	(হরিদ্বার—হৃষীকেশের মাঝখানে),

বীরভদ্রের এ্যান্টিবায়োটিক প্রকল্প

এই অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মশালার নাম ॥

বাবা কালীকমলি : পানজাব-সিন্ধ ক্ষেত্র।
ভগবান আশ্রম : জয়রাম অন্নক্ষেত্র।
আনন্দ আশ্রম : গোপাল কুঠি।
মানভারি : সাহারানপুরওয়ালি ধর্মশালা।
গীতা ভবন : পরমার্থ নিকেতন।
স্বর্গাশ্রম এবং শিবানন্দ আশ্রম।

পি ডবলু ইনশপেকশন বাংলো। রিজার্ভেশন : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি, দেরাদুন।

হাসপাতাল। জি ডি হাসপাতাল, উইমেন হাসপাতাল, শিবানন্দ আই হাসপাতাল। হৃষীকেশে আমিষ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ।

হরিদ্বার মুসৌরি অঞ্চলে ট্যুরিস্ট লজ

১।	ট্যুরিস্ট ব্যুরো	লালতারাও ব্রিজ, হরিদ্বার	১৯
২।	”	৬৬ গান্ধী রোড দেরাদুন	২১৭
৩।	”	হৃষীকেশ	২০৯
৪।	”	দি মল, মুসৌরি	৬৬৩
৫।	ট্যুরিস্ট বাংলো	মুনি-কি-রেতি	৩৭৩
৬।	”	হরিদ্বার	৩৭৯

চাকরাতা

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তারা সামরিক ছাউনি বা মিলিটারি ক্যানটনমেণ্ট পত্তন করে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সেনাছাউনি নতুন করে বহু জায়গাতেই হয়েছে, তবে পুরনো ছাউনিগুলি তুলে দিয়ে নয়। সেগুলি বজায় রেখে, সামরিক গুরুত্ব অনুযায়ী আরো কিছু ক্যানটনমেণ্ট তৈরি করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের চাকরাতা কিন্তু নতুন কিছু নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ৫৫-তম রেজিমেনটের করনেল হাইম ঘুরতে ঘুরতে এই পাহাড়ি অঞ্চলে এসে উপস্থিত হন সৈন্যসামন্তসহ। চারদিক দেখেশুনে এখানেই ছাউনি তৈরি শুরু করেন।

সমুদ্রপিঠ থেকে ৬,৯৫০ ফুট উঁচু। চাকরাতা ক্যানটনমেণ্ট পাশাপাশি দুই পাহাড়ের মাথা আর সানুদেশ জুড়ে—চাকরাতা আর কাইলনা। সিমলা আর মুসৌরির রাস্তা ৮০ বছর আগে যখন, এখানের ওপর দিয়ে যেতো, তখন এটা ছিলো শুধুই জঙ্গল আর বুনো তৃণাঞ্চল! দেরাদুন থেকে চাকরাতা প্রায় ৫৮ মাইলের মতো। রাস্তা পীচের। নিয়মিত বাস আছে। ট্যাক্সি আছে। এখানকার স্থানীয় পাহাড়ি মানুষদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ সরল। নাচ গান আর আলস্য। অবশ্যই লোকগীতি আর লোকনাট্য। বহুবিবাহ প্রচলিত।

অবশ্য দ্রষ্টব্য

দেববন: চাকরাতা থেকে ৭ মাইল। স্বাস্থ্যনিবাস। মনোরম পরিবেশ। সমুদ্রপিঠ থেকে ৯,৪০০ ফুট উঁচু।

লাক্ষামণ্ডল : লাক্ষাগৃহ অর্থাৎ জতুগৃহের ধ্বংসাবশেষ প্রধান দ্রষ্টব্য। কৌরবরা পাণ্ডবদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্যে যে জতুগৃহ তৈরি করে, স্থানীয় মানুষ বলে, এটা নাকি সেই জতুগৃহের ধ্বংসাবশেষ।

কলসী : প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কলসী। অশোকের সময়ের বেশ কিছু শিলালিপি অনুশাসন এখানে বর্তমান। দেরাদুন থেকে চাকরাতা যাবার পথে কলসী ৩২ মাইলের মাথায়।

টাইগার ফলস : চাকরাতা থেকে ৩ মাইল। উত্তরপ্রদেশের অন্যতম উঁচু জলপ্রপাত ও ঝর্ণা। পিকনিক-স্পট।

দেরাদুন	থেকে	৫৮ মাইল		পাকা পীচ রাস্তা
মুসৌরি	,,	৪৮	,, ভায়া যমুনা ব্রিজ	রাস্তা কাঁচা
হৃষীকেশ	,,	৮৪	,, ভায়া দেরাদুন	পাকা রাস্তা
সাহারানপুর	,,	৭৯	,, ভায়া তিমিলি	রাস্তা ভালো
টুইনি	,,	৫০	,, হেরবার্টপুর	কাঁচা রাস্তা (সিমলার পথে)

দেরাদুন—চাকরাতা, আগেই বলেছি; বাস নিয়মিত। তবে; কলসী থেকে রাস্তা একমুখী। ফলে, গেটে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী গাড়ি ছাড়া হয়।

দেরাদুন-চাকরাতা বাস ভাড়া (লোয়ার ক্লাস) ৫.০০ এর মধ্যে
দেরাদুন-কলসী ,, ,, ২.৬০ এর মধ্যে

থাকার জায়গা

চাকরাতায় এমনি কোনো হোটেল নেই। তবে কিছু রেস্ট হাউস আছে।

(১) ফরেস্ট রেস্ট হাউস : বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আধ মাইল
বাজার থেকে ২ ফার্লং

৩টে স্যুইট/রিজার্ভেশন : জেলাশাসক, দেরাদুন
ফোন ৩৮১৯ কিংবা ৩৫২৫

(২) জেলা পরিষদ বাংলো : বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দেড় মাইল
বাজার থেকে ১ মাইল

৪টে স্যুইট/রিজার্ভেশন : জেলাশাসক, দেরাদুন

ট্রেকিং-এর জন্যে

চাকরাতা-মুসৌরি	৩৮ মাইল
চাকরাতা-টুইনি	৩৮ মাইল
চাকরাতা-সিমলা	১১২ মাইল

বন্যজন্তু যা সচরাচর দেখা যায়

ঘাই হরিণ, প্যানথার, ভাল্লুক এবং নানা জাতের সারস

মুসৌরি শৈলশহরে

দেরাদুন থেকে পাকা ২২ মাইল সড়ক পথে। এমন সুন্দর শৈলসহর উত্তর ভারতে খুব কমই আছে। ছুটি কাটাবার পক্ষে এমন একটি শহরের পত্তন হয় ১৮২৭ সালে। ক্যাপটেন ইয়ং-এর মন জয় করে নেয় এর প্রাকৃতিক রূপ এবং রূপবৈশিষ্ট্য। গোটা মুসৌরি শহরটা যেন অতিথিদের আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরি হয়েছিলো। গরমকালে এর শীতের সহজ আদর ভোলার নয়। খুব একটা খাড়া পাহাড় বা চড়াই না থাকলেও, কাছাকাছি চতুর্দিকেই বেড়াবার জায়গা। ঘুরে আনন্দপাবার জায়গা। 'শৈলাবাসের সম্রাজ্ঞী' এর সার্বজনীন নাম। গান হিল থেকে হিমালয়ের শিখর-গুলি সত্যিকারের অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

রেল যোগাযোগ দেরাদুন পর্যন্ত। তারপর ২২ মাইল সড়ক। সরকারি বাস সাহারানপুর এবং দিললি থেকেও ছাড়ে। প্রচুর ট্যাক্সি। লাইব্রেরি আর ম্যাশোনিক লজের কাছেই ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড।

মুসৌরি—দেরাদুন ২২ মাইল
মুসৌরি—সাহারানপুর ৬৪ মাইল
মুসৌরি—দিললি ১৬৯ মাইল
মুসৌরি—চাকরাতা ৫০ মাইল
মুসৌরি—তেহরি ৪৫ মাইল
মুসৌরি—বারকোট ৫৮ মাইল।

হাতেটানা রিকসা, ড্যানডি আর খচ্চর (ছোট ঘোড়া) শহরের মধ্যেকার বাহন বিশেষ

অবশ্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি

(১) ধানোটি, ১২ মাইল—বাস পাওয়া যাবে। পিকনিক স্পট। এখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য অপূর্ব।

(২) সুরকুণ্ড দেবী—২০½ মাইল। ১৯ মাইল বাসে করে গিয়ে, বাকি দেড় মাইল হেঁটে।

(৩) যমুনা ব্রিজ—১৮ মাইল। বাস আছে। ট্রাউট মাছ ধরার জন্যে বিখ্যাত।

(৪) কেমপটি ফলস—প্রথম ৫ মাইল কাঁচা পথ। পরের ৯ মাইল পীচ রাস্তা।

(৫) মৌসি ফলস—সাড়ে তিন মাইল হাঁটা পথ।

(৬) ভাট্টা ফলস—সাড়ে ৭ মাইলের মধ্যে ৬ মাইল বাস, ১½ মাইল হাঁটা।

(৭) বিনং হিল—৬ মাইল হাইক করে পৌঁছুতে হবে।

(৮) গান হিল—১ মাইল। রেলওয়ে আছে।

(৯) মিউনিসিপ্যাল বাগিচা হেঁটে ২ মাইল। গাড়িতে একটু ঘুরে ৩ মাইল পড়বে।

(১০) লাল টিব্বা গার্ডেন ৩ মাইল।

হোটেল ও অন্যান্য থাকার জায়গা

(১) স্যাভয় [৪ তারকা বিশিষ্ট] লাইব্রেরি বাজার দিনে ১০০-২০০ মাথাপিছু ফোনঃ ৫১০

(২) হাকমেনশ হোটেল। দি মল। ৫০ থেকে ১০০ টাকা মাথাপিছু দিনে। ফোন ৫৫৯।

ভারতীয় কেতার হোটেল

(১) রোয়ানোক হোটেল। পিকচার প্যালেশের কাছে। ২৫ থেকে—৫০ টাকা মাথাপিছু। ফোন ২১৫।

(২) লাইব্রেরি ক্লাব হোটেল। লাইব্রেরি বাজার। ১২—৩৬ মাথাপিছু। ফোন ২৯৭।

(৩) ব্রেনট উড হোটেল। কুলরি বাজার। ১০—৩৫ মাথাপিছু দিনে। ফোন ৫৩৬।

(৪) সেনট্রাল হোটেল। কুলরি বাজার। ২০—৫০ মাথাপিছু দিনে। ফোন ৩২৬।

(৫) কনট ক্যাসল। কুলরিবাজার। ১২–৬০ মাথাপিছু দিনে। ফোন ৫৫৮।

এছাড়া, ঐ কুলরি বাজারে অনেকগুলি মাঝারি হোটেল আছে, ওয়ালনাট গ্রোভ, ডুনভিউ, এভারেস্ট হোটেল, রক্সি, মুসৌরি ক্লাব, সিলভারটন, রীগ্যাল, নন্দ ভিলা, নবীন, প্লাজা, ট্যুরিস্ট, নিউভারত প্রভৃতি প্রধান।

লাইব্রেরি বাজারেও হোটেলের সংখ্যা বিশেষ কম নেই। ইনডিয়া, আদর্শ, কাশ্মীর, ইমপিরিয়াল, প্রিন্স, স্নোভিউ প্রভৃতি।

অন্যান্য থাকার জায়গা

	রিজার্ভেশন
(১) পি ডবলু ডি ইনসপেকশন হাউস [প্রোভিনশিয়াল সার্ভিস রোড]	রিজার্ভেশন : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার পি ডবলু ডি (প্রোভিনশিয়াল) দেরাদুন
(২) পি ডবলু ডি ইনসপেকশন হাউস (সেনট্রাল) ক্যাসল হিল এসটেট	একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি (সেনট্রাল) দেরাদুন
(৩) ট্যুরিষ্ট হোম, ক্যামেলস ব্যাক [সিটি বোর্ড পরিচালিত]	একজিকিউটিভ অফিসার, সিটি বোর্ড, মুসৌরি

ইনফরমেশান সেণ্টার বা তথ্যকেন্দ্র

ইউ পি গভঃ ট্যুরিস্ট ব্যুরো, ঝুলানগরের কাছে। ফোন ৬৬৩

বিশেষ ব্যবস্থার জন্যে

আলাদা বাড়িও ভাড়া পাওয়া যায়। সে-ব্যাপারে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাদের নাম ঠিকানা নিচে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঃ

(১) ভাই গোবিন্দ সিং এ্যাণ্ড কোং। লাইব্রেরী বাজার। টেলিফোন ৩০৭

(২) ভাই ধ্যান সিং এ্যাণ্ড কোং। লাইব্রেরী বাজার। টেঃ ৬১১

(৩) ভার্গব হাউস এজেনসি। দি মল। টেঃ ২২৩

(৪) এফ নাথজী এ্যাণ্ড কোং। লাইব্রেরী বাজার। টেঃ ৩১৫

(৫) হামার এ্যাণ্ড কোং। কুলরি বাজার। টেঃ ৫০২

(৬) মহাবীর প্রসাদ এ্যাণ্ড কোং। কুলরি বাজার। টেঃ ৫৫৬

(৭) পুরণচাঁদ এ্যাণ্ড সনস। দি মল। টেঃ ৫১২
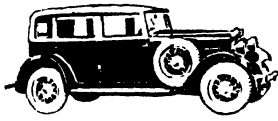
লখনৌ

গতবছরই লখনৌর উপর দিয়ে গেলাম কাশ্মীর। ফিরলামও সেই পুরনো নবাবী শহরের উপর দিয়ে। নামা হলো না। এবারের মতো লখনৌ শহরটিকে রেলগাড়ির মধ্যে থেকেই বিদায় জানাতে বাধ্য হলাম। এসেছিলাম, যখন স্কুলে পড়াশুনো করি। পুজোর ছুটির সময়। আমার বন্ধুর বাবা ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জী। তিনি সপরিবারে কার্যব্যপদেশে লখনৌ থাকেন তখন। ছত্তরমঞ্জিলে। ওঁর বড় ছেলে আমাদের পড়শি এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। ও বহুবারই আমাদের যেতে বলেছে। যাবো-যাবো করে যাওয়া হচ্ছিলো না। শেষপর্যন্ত পুজোর ছুটিতে চলে গেলাম দুম করে। ঐতিহাসিক এই শহর সম্পর্কে অদ্ভুত বিস্ময়কর সব গল্প শোনা ছিলো। গান, নাচ, নবাবদের স্মৃতি ভরপুর শহর এই লখনৌ। সেখানে কিছুদিনের জন্যে যেতে পারছি—ভেবেই মন চনমন করে উঠছে। ছেলেবেলার সেই উত্তেজনার কথা, মনে পড়লেও রোমাঞ্চ লাগে আজ।

লখনৌ নাম, লক্ষ্মণের নাম থেকে এসেছে বলে জনশ্রুতি। গোমতী নদীর দুই তীর ব্যেপে এই শহর। বাগান, পার্ক আর প্রাসাদের নগরী লখনৌ। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, উৎসব আর বর্ণবহুল মেলা-মচ্ছব এবং নবাবদের সম্পর্কে গল্প—এই নিয়ে লখনৌ।

(ক) অবশ্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি

(১) বড় ইমামবাড়া। ১৭৮৪ সালে নবাব আসফউদ্দৌলা এটি তৈরি করেন। লম্বায় ৪৯.৪ মিটার, প্রস্থে ১৬.২ মিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি হলঘর বলে প্রসিদ্ধ। ভুলভুলাইয়া বা গোলকধাঁধার জন্যে এই ইমামবাড়া বিখ্যাত। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ৬ কিমি দূর।

(২) রুমী দরওয়াজা। ইমামবাড়া ঢোকার সামনের গেটের নাম। স্থাপত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন।

(৩) হুসেনাবাদ ইমামবাড়া। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ৭ কিমি। সাদা গোল গম্বুজ, মিনার, তার সঙ্গে সুদৃশ্য বাগিচা।

(৪) ছবির গ্যালারি। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ৭ কিমি। নবাব মোহাম্মদ আলি শাহ এই প্রাসাদ তৈরী করেন। এখন এর দেয়ালে নবাব-বাদশাদের মূল্যবান তৈলচিত্র শোভা পাচ্ছে।

(৫) রেসিডেনসি। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ৩ কিমি। নবাব-দরবারে যে সমস্ত ইংরেজ রেসিডেনটরা ১৮৫৭ সালে লখনৌ অবরোধের পর আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে এই প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি দেয়ালে কামানের দাগ এখনো দেখা যায়। রিসেপশন, ব্যাঙ্কোয়েট হল আর মাটির নিচের ঘরগুলি দেখার জিনিস।

(৬) সিকানদারবাগ। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের প্রিয়তমা পত্নীর নামে এর নাম রাখা হয়েছে। গরমকালে নবাব এখানে এসে থাকতেন। প্রাসাদটির সংলগ্ন বাগান নিয়ে মোট ১০০ বর্গ মিটার জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের জাতীয় বোটানিক্যাল গারডেন এখন এখানে।

(৭) লা মারটিনিয়ার। আসফউদ্দৌলার রাজত্বকালে ফরাসী এ্যাডভেনচারিস্ট ক্লদ মারটিন এটি তৈরি করেন। ১৭৯৫ সালে তৈরি শেষ হয়। পাঁচদিকে পাঁচটি উঁচু সিঁড়ির উপর প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। সামনেই ফোয়ারা আর জলাধার। ফোয়ারাটি ৩৮·১ মিটার উঁচু। এখন একটি ইনটারমিডিয়েট কলেজ ওখানে চলে।

(ক) পিকনিক-স্পট॥ দিলখুশ, চিনহাট পিকনিক প্যাভিলিয়ন, কুকরেল ফরেস্ট এবং মুসাবাগ।

(খ) লখনৌ মশলিনের উপর চিকণের কাজের জন্যে বিখ্যাত। আতরের জন্যেও। দোকানপত্র করতে (১) হজরতগনজ

(২) আমিনাবাদ (৩) উত্তরপ্রদেশ এক্সপোরট করপোরেশন এমপোরিয়াম এবং (৪) চক।

কলকাতা, দিললি, পাটনার সঙ্গে বিমানযোগাযোগ আছে। লখনৌ বিমানঘাটির নাম আমাউসি। শহর থেকে ১৪ কিমি। উত্তরপূর্ব রেলপথের উপর। ভারতের সব বিশিষ্ট শহরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ আছে।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনস, ক্লারকস আবাদ, মহাত্মা গান্ধী মার্গ, লখনৌ। টেলি ২৪০৩০, ২৮০৮১।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনস আফিস। আমাউসি এয়ারপোরট। টেলি ৫১০৩০।

রেল অনুসন্ধানকেন্দ্র। ফোন ৫১২৩৪, ৫১৩৩১

উত্তরপূর্ব রেলপথ। ফোন ৫১৪৩৩

রেলস্টেশন। ফোন ২২৬৭৯

শহরের মধ্যে চলাচলের জন্যে সরকারি বাস আর ট্যাক্সি আছে

(ঘ) থাকার জায়গা :

ট্যুরিস্ট বাংলো

৬ সাপ্রু মার্গ

লখনৌ, টেলি : ২৯২১৪

(১) দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর ২৫ টাকা দৈনিক একক : ২০ টাকা

(২) ডরমিটরি : দিনে মাথাপিছু ৫ টাকা, খাবার দাম আলাদা।

পশ্চিমীকেতার হোটেল : ক্লারকস আভাধ, কারলটন, কাপুর

ভারতীয় হোটেল : দীপ হোটেল, ইলোরা হোটেল, গুলমারগ হোটেল, ট্যুরিস্ট হোটেল ও ওয়াই এম সি এ-তেও থাকার জায়গা পাওয়া যায়। টেলি ২৭২২৭ চারবাগ স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে। থাকা যায়। শুধু রেল প্যাসেনজাররাই থাকতে পারেন।

কুমায়ুনের নৈনিতাল আলমোড়া রানীক্ষেত

কুমায়ুন অঞ্চল উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে বেশী ট্যুরিস্ট আকর্ষক পাহাড়ি জনপদ। এখানে ছুটি কাটাতে মানুষ দৌড়ে আসে তীব্র সুন্দর হিমালয়ের কোলে অনাবিল সৌন্দর্যের টানে। ছুটি উপভোগের সঙ্গে মাছ ধরো, নৌকা বাও, ট্রেক করো—যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে দৌড়ে যাও—ভীষণ নির্জনতায়, জঙ্গলে, বরফের উপর স্কেটিং করো। এককথায় যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াও। গরমে এবং শরতকালে সবচেয়ে ভালো সময় বেড়ানোর পক্ষে। শীতেও, অবশ্য, বরফে আচ্ছন্ন শ্বেত সৌন্দর্যও দেখার মতো। অর্থাৎ কুমায়ুনে বছরের যে কোনা সময়ই সুসময়। কুমায়ুনে যাবার জন্য কালাকাল বিচার করতে বসতে হবে না।

নৈনিতাল॥ কুমায়ুনের হ্রদনগরী। ইংরেজ পর্যটক ঘুরতে ঘুরতে আজকের এই নৈনিকে আবিষ্কার করেন। সে অনেককাল আগের কথা। পাহাড় উপত্যকা জুড়ে নীল জলের হ্রদ। চারদিকে উইলো। তার পাতার গায়ে বাতাসের ফিসফিসানি। কী রঙবাহার চারদিকে। তারই মধ্যে রিকশা, ছোট ঘোড়া। দূরেকাছে ছবির মতো গ্রাম, সায়েবি বাংলা, হ্রদে ফুটফুটে নৌকো। সারাদিন একধরণের আলস্য ও ব্যস্ততার মিলমিশ। সন্ধ্যে হলো, সূর্য পাহাড়ের পিছনে মুখ লুকোলো—আর গোটা শহরটার চেহারাই গেলো পালটে। তখন গোটা অঞ্চলেই যেন এক অসহ্য যন্ত্রণাময় সৌন্দর্য লেগে আছে। একবার গেলে আর ফিরতে মন চাইবে না। কেমন স্বপ্নরাজ্য হ্রদজলে আলোর রেখা, রহস্যের হাতছানি। ১৯৪০ মিটার উঁচু, সমুদ্রপিঠ থেকে। প্রায় ১২ বর্গ কিলোমিটার মতো জায়গা জুড়ে এই নৈনিতাল শহর।

অবশ্য দ্রষ্টব্য জায়গা

১। নৈনা শৃঙ্গ (২৬১১ মিটার)। শহরের কাছে সবচেয়ে

সুন্দর পিকনিকের জায়গা। হিমালয়ের সৌন্দর্য একদিকে, অন্যদিকে পাহাড়ের চূড়া থেকে শহর দেখা যায়।

২। লারিয়া-কান্ত (২৪৩১ মিটার)। নৈনার পর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। এখান থেকে সহরের দৃশ্য চমৎকার।

৩। স্নো-ভিউ (২২৭০ মিটার)। খুব সহজেই এর চূড়ায় ওঠা যায়। এখান থেকে তুষারাবৃত চূড়াগুলি কী সুন্দর দেখায়।

৪। ডরোথির সীট (২২৯২ মিটার)। বিমান দুর্ঘটনায় হঠাৎ মৃত ইংরেজ রমণী ডরোথির স্মৃতিতে এই পাহাড়শৃঙ্গ উৎসর্গিত। এখান থেকে শহরের একাংশ দেখা যায়।

৫। ল্যাণ্ডশ এনড (২১১৮ মিটার)। খুরপা তাল এখান থেকে সুন্দর দেখা যায়। সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের মতো পাহাড়কাটা ক্ষেত।

৬। হনুমানগড়ি (১৯২১ মিটার)। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য চমৎকার। তীর্থযাত্রীরাও আসে।

(৭) অবজারভেটরী (১৯৫১ মিটার)। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র এবং গ্রহনক্ষত্রস্থান অবলোকন করা হয়।

৮। খুরপা তাল (১৬৩৫ মিটার)। এই হ্রদ মাছ-মারিয়েদের স্বর্গ।

৯। কিলবারি (২১৯৪ মিটার)। বনজঙ্গলে ভরা সুন্দর পরিবেশ।

নৈনিতাল থেকে কাছে দূরে

১। ভোয়ালি (১৭০৫ মিটার)—১১.৩ কিমি। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে খ্যাত। পাহাড়ি ফলমূলের একটি বড় বাজার আছে।

২। ভীমতাল (১৩৭০ মি)—২২.৫ কিমি। সুন্দর হ্রদ। নৌকাবিহার এবং পিকনিকের উপযোগী।

৩। নাওকুচিয়া তাল (১২২০ মি—২৬.৩ কিমি। পক্ষিনিবাস। মাছ ধরার জন্যে খ্যাত। সুন্দর নীলজলের এই হ্রদ ন-কোণা।

৪। সৎ তাল (১৩৭০ মি)—২০.৯ কিমি। প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব।

৫। রামগড় (১৭৯০ মি)—২৫.৭ কিমি। ফলের বাগবাগিচা নামে একটি ছোট্ট ছবি—গাঁ।

৬। মুক্তেশ্বর (২২৮৫ মি)—৫১.৫ কিমি। পশুপালন চিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র। দৃশ্যও চমৎকার।

৭। জিওলিকোট (১২২০ মি)—১৭.৭ কিমি। স্বাস্থ্যনিবাস। মৌমাছির চাষ হয়। বহুরঙের প্রজাপতি পাওয়া যায়।

আলমোড়া

আলমোড়া স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে বিখ্যাত। চারদিকে হিমালয় পাহাড় শ্রেণী। আলমোড়া শহরটিও কশায় নামে একটি পাহাড়ের চূড়ায়। ভগবান বিষ্ণুর আবাস হিসাবে পুণ্যভূমি। ১২ বর্গ কিলোমিটারের কিছু কম। উচ্চতা ১৬৪৫ মিটার।

অবশ্য দ্রষ্টব্য

(১) বৈজনাথ (১১২৫ মি) আলমোড়া থেকে ৭১ কিমি, গরুড় উপত্যকায় সারিবদ্ধ প্রাচীন কয়েকটি মন্দির। দ্বাদশ—ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পুরনো প্রস্তরমূর্তি আছে।

(২) ভগেশ্বর—আলমোড়া থেকে ৯০ কিমি মোটর রাস্তায়। তীর্থস্থান। কাশীর মতন শিবের মন্দিরের জন্যে বিখ্যাত।

(৩) বিনশার (২৪১২)—আলমোড়া থেকে ৩০ কিমি। স্বাস্থ্যনিবাস।

(৪) গণনাথ—৪৭ কিমি। শিবমন্দির। সমুদ্রপিঠ থেকে ২১২০ মিটার উঁচু। গুহা আছে অনেকগুলি।

(৫) যোগেশ্বর—৩৭ কিমি। ১২ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলে জনশ্রুতি। দেবদারু বনের ভিতরে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এই মন্দির। স্থাপত্য নিদর্শন প্রচুর।

(৬) কাটারমল—কাটারমলে অবস্থিত সূর্যমন্দির ৮০০ বছরের পুরনো আলমোড়া থেকে ১ কিমি গেলে বিকুট জঙ্গল।

(৭) কৌশানি—১৮৯০ মিটার উঁচু পাহাড়চূড়ায় বাংলো আছে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ।

(৮) পিণ্ডারী হিমবাহ—ভারারি বাসগুমটি থেকে ৫৬ কিমি ট্রেক করে গেলেই পিণ্ডারী হিমবাহ। তিন কিমি দীর্ঘ, এক-চতুর্থাংশ কিমি আড়ে। এ-অঞ্চলে কেউ এলে পিণ্ডারী না দেখে ফেরে না।

রাণীক্ষেত

রাণীক্ষেতে কোনো একটা সময় নাকি জনৈকা রাণী বর্তমান রাণীক্ষেত ক্লাবের কাছে শিবির পেতে কিছুকাল ছিলেন। সে ধরা যাক গল্পেরই বিষয়। কিন্তু রাণীক্ষেতের সৌন্দর্য দেখে নামের কারণ যে কেউ অনুমান করতে পারবেন। মোট আয়তন ২২ বর্গ কিলো-মিটারের মতো সমুদ্রপিষ্ঠ থেকে ১৮৩০ মিটার উঁচু।

অবশ্য দ্রষ্টব্য

১। চৌবাট্টিয়া রাণীক্ষেত থেকে ১০ কিমি। বাট মানে রাস্তা। চার রাস্তার মিলন স্থল। সুন্দর বাগিচা। এখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। রাণীক্ষেত থেকে নিয়মিত বাস আছে। সরকারি বাগ-বাগিচা আর ফল গবেষণা কেন্দ্র। চৌবাট্টিয়া আপেলের জন্যে বিখ্যাত।

২। ভালুদাম। চৌবাট্টিয়া থেকে ৩ কিমির-ও কম। বানানো হ্রদ।

৩। উপৎ এবং কালকা। বাসগুমটি থেকে আলমোড়ার পথে ৬ কিমি। ভারতে যতগুলি গলফ খেলার মাঠ আছে পাহাড়ি অঞ্চলে, উপৎ তাদের অন্যতম। হয়তো সবসেরা মাঠ। কালিকার কালী মন্দির দ্রষ্টব্য। বনবিভাগের একটি নার্শারিও আছে।

৪। মাজখালি। আলমোড়ার পথে ১৩ কিমি। এখান থেকে তুষারাচ্ছন্ন শিখরের দৃশ্য মনোরম।

৫। তারিক্ষেত। একটি ছোটখাট শহর গড়ে উঠছে। রাণীক্ষেত থেকে রামনগরের পথে ৮ কিমি। গান্ধীজী এখানে কিছুকাল ছিলেন। তার স্মারক হিসাবে কুঠি সংরক্ষিত।

৬। দোয়ারাহাট। কর্ণ প্রয়াগের রাস্তায় ৩৮ কিমি। কুমায়ুনে ঐতিহাসিক ও প্রাচীন জায়গা বলতে এই দোয়ারাহাট। কাত্যুরি রাজার রাজধানী। শতদ্রু থেকে গণ্ডক এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমতলভূমি, রাজত্ব করে গেছেন। অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আটভাগে বিভক্ত হয়ে এখনো বর্তমান।

৭। দুনাগির। রাণীক্ষেত থেকে ৫২ কিমি। তীর্থক্ষেত্র। দেবী দুর্গার মন্দিরের গায়ে ১১৮১ সালের লিপি খোদাই করা।

৮। শীতলাক্ষেত। রাণীক্ষেত থেকে ২৬ কিমি। মোটরে যেতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়।

উত্তর প্রদেশ সরকারের কুমায়ুন ডিভিশন ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ডিলুক্স বাসে পর্যটকদের কাছে দূরের জায়গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন।

১। ভীমতাল: অর্ধেকদিনের সফর। এই সফরসূচীতে ভোয়ালি, ভীমতাল, নাওকুচিয়াতাল এবং ঘোরাখাল দেখা যাবে। ভীমতাল আর নাওকুচিয়াতালের হ্রদ এবং ঘোরাখালের মন্দির দ্রষ্টব্য।

স্ত্রী বা পুরুষ পিছু ১৫.০০ বাচ্চা পিছু ১১.২৫

এর মধ্যে টোল ট্যাক্স, গাইড চার্জ সবই মিটে যাবে।

২। দুদিনের সফরসূচীর মধ্যে আলমোরা, রাণীক্ষেত, চৌবটিয়া বাগিচা এবং কাইঞ্চি মন্দির দেখা যাবে। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে থাকা। দারুণ প্রাকৃতিক পরিবেশ। এছাড়াও, একটি বনবাংলো আছে, যার জন্যে ডি এফ ও দেরাদুনকে লিখতে হবে।

পুরুষ/স্ত্রী পিছু দুদিনের খরচ ৬৮.০০

বাচ্চা পিছু ৫১.০০

কৌশানিতে থাকা খাওয়া, টোলট্যাক্স, গাইড চার্জ অন্তর্ভুক্ত।

৩। বদ্রীনাথ: বদ্রীনাথ দর্শন এখন নৈনিতাল থেকেই সম্ভব। চারদিনের সফর।

রাত্রিবাস—কর্ণপ্রয়াগ আর বদ্রীনাথ।

পুরুষ/স্ত্রী মাথাপিছু ১৬০.০০

বাচ্চা ১২০.০০

৪। নৈনিতাল অবজারভেটরী: অবজারভেটরী থেকে চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র দেখা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। হনুমান মন্দিরও দেখা যাবে।

পুরুষ/স্ত্রী পিছু ৪ ০০ শিশু ৩.০০

৫। করবেট ন্যাশনাল পারক: দুদিনের ভ্রমণসূচী। রাণীক্ষেত জিম করবেট মিউজিয়ম, কালাধুংগি এবং করবেট ন্যাশনাল পারক।

পুরুষ/স্ত্রী পিছু ৯৬.০০ ॥ শিশু ৭৫.০০ ॥

এর মধ্যে থাকার জায়গা, হাতিতে চড়ে জন্তুজানোয়ার দেখা অন্তভুক্ত।

৬। কুমায়ূনদর্শন: তিনদিনের ভ্রমণসূচীতে কৌশানি, পিথোরাগড়, আলমোরা, রাণীক্ষেত এবং যোগেশ্বর।

পুরুষ/স্ত্রী ১৬০.০০ ॥ শিশু ১২০ ০০ ॥

এই ভ্রমণসূচীর জন্যে যোগাযোগকেন্দ্র:

১। ট্যুরিস্ট ব্যুরো, মল রোড, টেলি ৪০

২। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম, সচিবালয়, নৈনিতাল। টেলি ৩৩৩

দেরাদুন

কলকাতা থেকে রেলপথে			১৫২৬ কিমি
বমবে	,,	,,	১৭০৪ ,,
দিললি	,,	,,	৩১৪ ,,
বারাণসী	,,	,,	৯৪৫ ,,
লখনৌ	,,	,,	৫৪৪ ,,

সড়কপথে

হৃষীকেশ	৪৩ কিমি	সাহারানপুর	৬৯ কিমি	হরিদ্বার	৬৯ কিমি
দিললি	২৫৮ ,,	চণ্ডীগড	১৪৩ ,,	মথুরা	৪০২ ,,
মুসৌরি	৩৬ ,,	মুসৌরি (ভায়া চাম্বা)	১৭৯ ,,	চাকরাতা	৯৩ ,,
ডাকপাথর	৪৩ ,,	পাউরি	,,	গোপেশ্বর	২৬১ ,,
চামোলি	১৫০ ,,	তেহরি	১৩৫ ,,		

থাকার প্রকৃষ্ট সময় : মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই
মধ্য-সেপটেম্বর ,, মধ্য-অকটোবর
গোটা শীতকালটাই খুব সুন্দর। ভাষা : হিন্দি, ইংরাজি, পানজাবি, গাড়োয়ালি। সমুদ্রপিঠ থেকে ২১০০ ফুট। লোকসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ।

উত্তরপ্রদেশ সরকার দিললি-দেরাদুন ডিলুক্স নিশা-বাস চালায় নিয়মিত। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। শহরের ভিতরে ট্যাক্সি চালু। বিশেষ উপলক্ষে ট্যাক্সি পাবার জন্যে : (১) অজিত ট্রাভেলিং সারভিস, লোক্যাল বাসস্ট্যাণ্ড (ফোন ৩৪৩৭), (২) অভয় দুন মোটর ট্যাক্সি সারভিস, বাসট্যাণ্ড (৩৬৬৮), (৩) আদর্শ ট্যাক্সি সারভিস, বাসস্ট্যাণ্ড (৪২৩১) (৪) এ্যামবাসাডর ট্যাক্সি সারভিস,

বাসস্ট্যাণ্ড—৪৩৬৩ (৫) সুশীল ট্যাক্সি সারভিস, ট্যুরিস্ট অফিসের উলটোদিকে—৪৬২৯ (৬) পানজাব ট্যাক্সি সারভিস, বাসস্ট্যাণ্ড—৩৪৫৬ (৭) স্কুটার—মিটার নেই। দরদাম আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে।

হোটেল

এ্যারোমা। ১২ নিউ রোড। ফোন ৪৪৮১
সেনট্রাল। চাকরাতা রোড
কনট। " । ৩১৬৪
ডুন গেস্ট হাউস। রাজপুর রোড
ডুন ভিউ। রাজপুর রোড। ৪৫৪২
ডুনগা হাউস। নিউ সারভে রোড। ৪৭৪৩
ইনডিয়ানা। রাজপুর রোড। ৪২৪৯
কোয়ালিটি। " । ৫৩২১
ম্যাজেস্টিক। " । ৩২৩৯
মেট্রো। " । ৩২৩৯
ওরিয়েনটাল। দর্শনী গেট। ৪২৫৬
পাশা। রাজপুর রোড। ৪০৭২
পার্ক ভিউ। " । ৩২৩১

এছাড়াও, প্রিন্স, রিজেন্ট, সুখসদন, ট্যুরিস্ট, ভিকটোরিয়া, হোয়াইট হাউস প্রভৃতি।

ইনসপেকশন বাংলো

(১) ক্যানাল ইনসপেকশন হাউস। বীজাপুর। রিজার্ভেশন : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র
ফোন : ৩৫৩৫ সাহারানপুর, ফোন : ৪১

(২) ক্যানাল ইনসপেকশন হাউস। রাজপুর। ”

(৩) ফরেস্ট রেস্ট হাউস। চাকরাতা রোড। ডি এফ ও (পশ্চিম), দেরাদুন ফোন : ৩৭১০

(৪) দেরাদুন সার্কিট হাউস। ক্যানটনমেনট রোড। জেলাশাসক, দেরাদুন। ফোন : ৩৮১৯
ফোন : ৩৫৭৩ কিংবা ৩৫৫৫

(৫) সার্কিট হাউস (এ্যানেক্স)। ক্যানটনমেনট রোড। ”
ফোন : ৩৩২৫

(৬) পূর্তবিভাগের বাংলো। সহস্রধারা। একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি (প্রভিনসিয়াল), দেরাদুন। ফোন : ৩৭৪৬

(৭) পূর্ত বাংলো। রাজপুর রোড। ”
ফোনঃ ৩৮২০

(৮) ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস। সহস্রধারা। এ্যাসিঃ ট্যুরিস্ট অফিসার, ৬৬ গান্ধী রোড, দেরাদুন, ফোন : ৩২১৭

ধর্মশালা

(১) আগরওয়াল ধর্মশালা। স্টেশন রোড

(২) জৈন ধর্মশালা। স্টেশন রোড

(৩) শিবাজী ধর্মশালা। সাহারানপুর রোড

ইয়ং উইমেনস ক্রিশ্চিয়ানস এসোসিয়েশন, ৪ নিউ ক্যানটনমেন্ট রোড, দেরাদুন—এখানে মেয়েরা কেবল থাকতে পারেন। থাকার জন্যে: সেক্রেটারি—ওয়াই ডবলু সি এ-কে লিখতে হবে।

দেরাদুনে ক্লাব-রেস্টুরেন্টের ছড়াছড়ি। রেস্টুরেন্টের মধ্যে—আলিবাবা, বেঙ্গলী সুইটশপ, ঈভস, ইনডিয়ানা জিমিস কিচেন, কোয়ালিটি, মাদরাজ, প্রিনশ, রয়াল কাফে, নাপোলি, ওরিয়েনটাল প্রভৃতি।

ক্লাব: উলকা ক্লাব, দুন ক্লাব, জে, সি, আই, লায়নস ক্লাব, রোটারি ক্লাব, শিবালিক ক্লাব।

পান্থশালা:

ইনডিয়ানা	এ্যাশলে হল	৪১৪৯
কোয়ালিটি	রাজপুর রোড	৩৩৩৪
ম্যাজেস্টিক	”	৩৪৮১
প্রিনস	হরদোয়ার রোড	৩৮৩৮
রয়্যাল কাফে	এ্যাসলে হল	৩৩২১
বিজয়	গান্ধী রোড	৪২২৪
হোয়াইট হাউস	সুভাষ রোড	৩৬৯৪

হাসপাতাল

(১) করোনেশন হাসপাতাল। দালানওয়ালা। ৩৯৪৮

(২) দুন হাসপাতাল। কাছারি রোড। ৩৫৭৮

(৩) উইমেনস হাসপাতাল। কাছারি রোড। ৩৭৪৩

প্রধান উৎসব আর মেলা

(১) **ঝাণ্ডা উৎসব :** এই জেলার সবচেয়ে বড় উৎসব। শ্রীগুরুরাম রাই আসছেন ব'লে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্যে হোলির পঞ্চম দিনে বিরাট এক সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান হয়। এটি একটি অসাধারণ আনন্দ উৎসব।

(২) **তপকেশ্বর উৎসব :** দেরাদুন থেকে ৩ মাইল দূরে বিখ্যাত তপকেশ্বর মন্দির। প্রতিবছর শিবরাত্রির দিন এখানে খুব বড় একটি মেলা বসে।

(৩) **চণ্ডীদেবী মেলা :** দেরাদুন থেকে ৭ মাইল দূর, রাজপুরে এই বিখ্যাত চণ্ডীমেলা ফি-বছর এপরিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

লাইসেনস নিয়ে শিকার

কী কী শিকার চলে : বাঘ, প্যানথর, চিতল হরিণ, ঘাই হরিণ, হগ ডিয়ার, সম্বার, নীলগাই, বুনো হাতি, বরা প্রভৃতি।

শিকারের সময় : ছোট শিকার ॥ অকটোবর—মারচ
বড় শিকার ॥ অকটোবর—মে

লাইসেনস ফী : আবেদনপত্রের সঙ্গে ১ টাকা জমা দিতে হবে। স্মলগেম-এর ক্ষেত্রে পারমিট ফী ২৫ টাকা। বিগ গেমের আবেদনপত্রের দাম ৫ টাকা। পারমিট ফী ৫০ টাকা।

	স্যুটিং ব্লকের নাম	থাকার জায়গা/দূরত্ব [মাইল]	রাস্তা
(১)	ঝারবাওয়ালা	১৭মা/থাকার জায়গা নেই	ফরেষ্ট রোড
(২)	গোলাতাপ্পার	২০ মা/ফরেস্ট রেস্ট হাউস	,, ,,
(৩)	বারকোট	২০ মা/ ,, ,, ,,	পি ডবলু রোড

(৪) থানো ১২ মা/ফরেস্ট রেস্ট হাউস ফরেস্ট রোড
(৫) মাইদান ২৯ মা/ ,, ,, ,, ,,
(৬) লাছিওয়ালা ১১ মা/ফরেস্ট রেস্ট হাউস পি ডবলু রোড

পাখি শিকারের জন্যে পারমিট দেবেন ডি এফ ও (পূর্ব) দেরাদুন

জন্তু-জানোয়ার শিকারের জন্যে চীফ ওয়াইলড লাইফ ওয়ার্ডেন, ইউ পি (লখনৌ)

মাছ-শিকার যাঁদের নেশা, তাঁদের জন্যে

(১) সত্যনারায়ণ : দেরাদুন-হরিদ্বারের রাস্তায় ৩৪ মাইলের মাথায় সত্যনারায়ণ। ফরেস্ট রেস্ট হাউসের জন্যে এবং মাছ ধরার অনুমতির জন্যে ডি এফ ও (পূর্ব) দেরাদুনকে লিখতে হবে। সত্যনারায়ণ এবং মোতিচুর দুজায়গায় রেস্ট হাউস আছে।

(২) কান্‌সরো : দেরাদুন-হরিদ্বার রেলপথে প্রায় ২১ মাইলের মাথায়। কান্‌সরো আর গোলাতাপ্পার দুজায়গাতেই দুটো রেস্ট হাউস আছে। মাছ ধরার অনুমতির জন্যে সেই ডি এফ ও (পূর্ব)-কে লিখতে হবে।

(৩) থালিপুর : দেরাদুন থেকে ২৩ মাইল। তিমলির সুন্দর বনবাংলোর জন্যে এবং মাছ ধরার পারমিটের জন্যে ডি এফ ও (পশ্চিম), দেরাদুন—এঁকে যোগাযোগ করতে হবে।

(৪) কুলহাল : ২৮ মাইল দূর। তিমলিতেই থাকতে হবে। ডি এফ ও (পশ্চিম)-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

মোটরিস্টগণ তাঁদের নানা সুবিধা-অসুবিধার জন্যে অটোমোবিল এ্যাসোসিয়েশন, আপার ইনডিয়া, এ্যাসটলি হল, দেরাদুন। ফোন ৪৩৬১—এখানে যোগাযোগ করুন।

উত্তরপ্রদেশের ট্যুরিস্ট ব্যুরোর তালিকা

১।	রিজিওনাল ট্যুরিস্ট অফিসার. ট্যুরিস্ট ব্যুরো, বারাণসী—২	ফোন : ৬৩১৮৬
২।	রিজিওনাল ট্যুরিস্ট অফিসার, ৬ শক্রমার্গ, লখনউ	২১২১৪
৩।	” ট্যুরিস্ট অফিসার, স্টেডিয়াম বিলডিং, দি মল, আগ্রা	৭৫৮৫২
৪।	” ” দি মল, নৈনিতাল	৪০
৫।	” ” লালতা রাও ব্রিজ, হরিদ্বার	১৯
৬।	” ” উত্তরপ্রদেশ সরকার ট্যুরিস্ট ব্যুরো ‘চন্দ্রলোক’ ৩৬ জনপথ, নয়াদিললি	৪২৯৪৯
৭।	এ্যাসিঃ ট্যুরিস্ট অফিসার, ট্যুরিস্ট ব্যুরো, শ্রীনগর (পাওরি-গাড়োয়াল)	১০
৮।	” ” ” গান্ধী রোড .দয়াহুন	৩২১৭
৯।	” ” ” কোদায়ায়া (পাওরি-গাড়োয়াল)	৫ পি. পি.
১০।	” ” ” রাণীক্ষেত	২৭
১১।	” ” ” অযোধ্যা (ফৈজাবাদ)	৩০

১২।	ব্রি	পসনিস্ট, ট্যুরিস্ট ব্যুরো, মুসৌরি		৬৬৩
১৩।	”	”	হৃষীকেশ, দেরাদুন	২০৯
১৪।	”	”	আলমোরা	৪৬ পি. পি
১৫।	”	”	রেলস্টেশন, কাঠগুদাম	২৯৩ একসটেনশন

ট্যুরিস্ট বাংলোর তালিকা : উত্তরপ্রদেশ

১।	ট্যুরিস্ট অফিসার,	ট্যুরিস্ট বাংলো,	রাজা-কি-মণ্ডী, রেলস্টেশন, আগ্রা		৭২১২৩
২।	ব্রিজঃ ”	”	”	প্যারেড কুঠির কাছে, বারাণসী—২	৬৩১৮৬
৩।	—	”	”	৩৫ এম জি মার্গ, এলাহাবাদ	৪২১১
৪।	—	”	”	বেলওয়ালা, হরদোয়ার	৩৭৯
৫।	ব্রিজঃ ”	”	”	৬ শত্রু মার্গ, লখনৌ	২৯২১৪
৬।	এ্যাসিঃ ”	”	”	অযোধ্যা (ফৈজাবাদ)	৩০
৭।	—	”	”	সারনাথ (বারাণসী)	—
৮।	—	”	”	মুণী-কি-রেতি (হৃষীকেশ) তেহরি গাড়োয়াল	৩৩
৯।	এ্যাসিঃ ট্যুরিস্ট অফিসার	”		শ্রীনগর (পাওরি-গাড়োয়াল)	১৭

সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তার নাম ঠিকানা

(১) বাজমে জিগর। গান্ধী রোড
(২) হিন্দি সাহিত্য সমিতি। পলটন বাজার
(৩) হিন্দি সাহিত্য সংসদ। এ্যাস্টলে হল
(৪) হিমালয় পরিষদ। ডুন স্কুল
(৫) জাগৃতি। ই সি রোড
(৬) লায়নস ক্লাব } দি ডুন ক্লাব
(৭) রোটারি ক্লাব }
(৮) উলকা ইনটারন্যাশানাল। কোয়ালিটি

গ্যালারি

(১) ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিট্যুট মিউজিয়াম। ১০-৩০—৪টে পর্যন্ত খোলা। রবিবার বন্ধ।

অবশ্য দ্রষ্টব্য জায়গা। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) স্তম্ভ স্মারক (সংরক্ষিত): (ক) কলসীর শিলালিপি অনুশাসন—অশোকের। দেরাদুন থেকে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। বড় বড় পাথরের উপর অনুশাসন খোদাই করা। সারাদিন যে কেউ গিয়ে দেখে আসতে পারে। কোনো প্রবেশমূল্য বা দর্শনী নেই।

(খ) জগতগ্রাম: কলসীর প্রায় কাছে—অশ্বমেধ যজ্ঞ এখানে হয়েছিল বলে জনশ্রুতি। খননের ফলে প্রমাণিত যে তৃতীয় শতাব্দীর রাজা শালীবাহন এখানেই অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। খোলামাঠ। দর্শনী নেই।

(গ) কলাঙ্গস্তম্ভ: দেরাদুন শহর থেকে ৩/৩½ মাইলের মধ্যে। গোরখা জেনারেল বলভদ্র থাপার স্মরণে স্তম্ভ। ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ মেজর জেনারেল গোলিপসিকে, তাঁর বাহিনীসমেত সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন।

(ঘ) লাক্ষামণ্ডল:—চাকরাতার কাছে। দেরাদুন থেকে চাকরাতা হয়ে যেতে হবে। ২৬ মাইল পায়ে চলা পথ। অন্য কোন যানবাহন নেই। মন্দিরটি তার সুন্দর, সুকুমার ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কাজের জন্যে বিখ্যাত। ৮ম থেকে—আনুমানিক ১৫ শতাব্দীর গুপ্তযুগের লিপি খোদাই করা। এখানেও দর্শনী নেই।

(ঙ) মহাসু মন্দির: চাকরাতা থেকেই ৪০ মাইল। এখানেও মন্দির স্থাপত্যের ভাঙাচোরা নিদর্শন।

বাগিচা

(১) সুভাষ উদ্যান: রাজপুর রোড

(২) বোটানিক্যাল গারডেন: ফরেস্ট ইনসটিট্যুট

পিকনিক স্পট

(১) সহস্রধারা॥ ৯ মাইল। বাসে যাওয়া যাবে। পূর্তবাংলো।

(২) তাপকেশ্বর॥ ৩½ মাইল। প্রাইভেট বাস গারহি পর্যন্ত নিয়ে যাবে। বাকি আধ মাইলটাক হাটন।

(৩) রবারস কেভ বা ডাকাতে গুহা॥ ৫ মাইল। বাস আনারওয়ালা গ্রাম (৪ মা:) পর্যন্ত যাবে। বর্ষা ছাড়া সব সময়ই সুন্দর।

(৪) তপোবন॥ ৩ মাইল। বাস দু মাইল অর্থাৎ রায়পুর রোড ধরে দু মাইল যাবে। কিছু কিছু আশ্রম আছে। যে কেউ গিয়ে থাকতে পারে।

(৫) লক্ষ্মণসিদ্ধ॥ ৭ মাইল। হৃষীকেশের পথে ৬ মাইল পর্যন্ত বাস। স্বামী লক্ষ্মণ সিদ্ধর সমাধি গভীর জঙ্গলে। দোকানপাট কিছু নেই। থাকার জায়গার কথাই ওঠে না।

(৬) ডাকপাথর ব্যারেজ॥ ২৮ মাইল। বেসরকারি বাস আছে। যমুনা ব্যারেজ প্রকল্পের হসটেল। ছোট্ট বাজার। সুন্দর পিকনিক স্পট।

উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠান

(১) ফরেস্ট রিসার্চ ইনসটিট্যুট : চাকরাতা রোড

(২) গভঃ ইনডাসট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনিক্যাল ইনসটিট্যুট : রাজপুর রোড

(৩) ইনডিয়ান মিলিটারী একাডেমি : চাকরতা রোড

(৪) ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনসটিট্যুট ফর উইমেন : ই, সি, রোড

(৫) রাষ্ট্রীয় ইনডিয়ান মিলিটারি একাডেমি : ক্যানটনমেণ্ট

(৬) ট্রেনিং সেণ্টার ফর প্রডাক্ট্স ব্লাইণ্ড : রাজপুর রোড

(৭) ডুন স্কুল : দি মল (জনদল ব্রিজের কাছে)
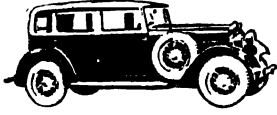
হর-কি-ডুন * টনস উপত্যকা

সেই আদি যুগ থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এবং পর্যটক যমুনোত্রী শিখর (১৭১০') সানুতে ছুটে এসেছেন যমুনোত্রীর সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে। যমুনার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সেই বিখ্যাত টনস উপত্যকা। যারা জানে, তারা জানে কী অপরূপ সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত এই উপত্যকা। দুর্ভাগ্য, এ-সম্পর্কে প্রচার বিশেষ হয়নি, তাই অনেক পর্যটনবিলাসী মানুষ এখানকার কথা এখনো তেমনভাবে জানেন না। আমরা সংক্ষেপে জায়গাটার বিবরণ দেবো।

গোটা টনস উপত্যকা ঘিরে আছে তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়শ্রেণী, মধ্যে বনভূমি আর সবুজ প্রান্তর। উত্তরকাশী জেলার পুরোলা মহকুমার মধ্যে এই উপত্যকা। বনবিভাগের ভাষায় এর নাম টনস ফরেস্ট ডিভিশন। উত্তরপ্রদেশের যে দুটি বন্য প্রাণী অধ্যুষিত বনভূমি, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গোবিন্দ পাণ্ডু বিহার এই ডিভিশনে পড়ছে।

গোবিন্দ পাণ্ডু বিহারের আয়তন ৩৬৮ বর্গমাইল। ৪৬০০ ফুট উচ্চতা থেকে ২০,০০০ ফুটের মধ্যে অবস্থিত। আপার টনস ভ্যালী দিয়ে গোবিন্দপাণ্ডু যেতে হবে।

দূরে দূরে ছোট পাহাড়ি গ্রাম। মহকুমার গ্রামসংখ্যা ১৬৮। লোকসংখ্যা ২৮,২২৬।

'খাস' নামের জাতির বাস। গায়ের রং খুবই ফরসা। মুখ চোখ সুন্দর, ফরসা। কথিত, আর্যদের সঙ্গেই তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। লোয়ার টনস ভ্যালির লোকদের বলে জোনসারিস আর আপার ভ্যালির লোকদের রাওয়াইস।

মূলত হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী, এদের আচার-বিচারে অন্যদের সঙ্গে

কারাক বিস্তর। কুরুর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন এদের উপাস্য দেবতা। আপার টনস ভ্যালির।

দেরাদুন-নবগাঁও-পুরোলা-মোরি কিংবা দেরাদুন-টুনি-থাডিয়ার-মোরি হয়ে উপত্যকা। যাঁরা ট্রেক করতে ভালোবাসেন তাঁরা টনস নদী এবং হর-কি-দুন নালা হয়ে হর-কি-দুন (১১২০০´ ফুট) পৌছুতে পারেন।

কীভাবে যাওয়া যাবে—তার বিশদ বিবরণ

১ম দিন দেরাদুন থেকে বাস পুরোলা (৫৫০০') ৯৫ মাইল ফরেস্ট বাংলোয় থাকা

[কুলি বা খচ্চরের ব্যবস্থা এবং খাওয়া দাওয়া কেনাকাটার ব্যবস্থা পুরোলা বা মোরি থেকে করতে হবে।]

পুরোলা থেকে বাস জারমোলা (৫৬৭৫') ৮ মাইল "

জারমোলা " " মোরি (৩০০০') ৬ " গ্রামে থাকার ব্যবস্থা আছে

২য় দিন মোরি থেকে হাঁটাপথ নাইটওয়ার (৪৬০০') ৫ " বনবাংলো

৩য় দিন নাইটওয়ার " " তালুক (৬৫০০') ১২ " "

৪র্থ দিন তালুক " " ওসলা (৮৪০০') ৯ " "

৫ম দিন ওয়ালা " " হর-কি-দুন(১১,২০০') ৬ " "

৬ষ্ঠ দিন হর-কি-দুন " " যমদুয়ার গ্লেসিয়ার ২ " গ্রাম শেষ।

আর রাস্তা নেই। খাড়া পাহাড় পথ। খুব দুর্গম।

যমদুয়ার গ্লেসিয়ার থেকে হাঁটাপথে ওসালা ফরেস্ট হাউস ৬ মাইল (ওশলা গ্রাম হয়ে)

অবশ্য দ্রষ্টব্য মন্দির

(১) পদমু মন্দির, নাইটওয়ার

(২) কর্ণ মন্দির, দেওয়া (নাইটওয়ার থেকে ১ মাইল)

(৩) ওসালার দুর্যোধন মন্দির

ফরেস্ট বাংলোগুলির রিজার্ভেশনের জন্যে : ডি এফ ও, টনস ফরেস্ট ডিভিশন, পুরোলা জেলা : উত্তরকাশী, উত্তরপ্রদেশ

অন্যান্য তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করবেন :

এ্যাসিসট্যান্ট ডিরেকটর, ট্যুরিজম
গাড়োয়াল ডিভিশন, ইউ পি
বা
ট্যুরিস্ট ব্যুরো, ঝুলাঘর, মুসৌরি, উত্তরপ্রদেশ।

বাস সার্ভিসের জন্যে যোগাযোগ করবেন :

দি হাইওয়ে মোটর ট্রানসপোরট কোং
৬৯, গান্ধী রোড, দেরাদুন, উত্তরপ্রদেশ

হেমকুণ্ড লোকপাল এবং ফুলের উপত্যকা

গাড়োয়াল পাহাড় শ্রেণী তথা গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে সবচেয়ে সুন্দর যে দুটি পর্যটক আকর্ষক দেবভূমি আছে, তার একটি শিখতীর্থ হেমকুণ্ড-লোকপাল এবং অন্যটি ফুলের উপত্যকা বা ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস।

হেমকুণ্ড—লোকপাল

এই পবিত্র তীর্থস্থান ১৯৩৬-এ আবিষ্কৃত। এখানেই শিখ সম্প্রদায়ের দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ সিং তাঁর পূর্বতন কোনো জন্মে দেব পূজা ও ধ্যান করে দৈবাজ্ঞা পান, যে তিনি আবার জন্ম নেবেন এবং খালসা ধর্ম প্রবর্তন করবেন। বদরিনাথ থেকে ২৪ কিমি দক্ষিণ পূবে, মধ্য হিমালয়ে অবস্থিত। জায়গাটি ২ কিমি লম্বা, আধ কিমি

চওড়া। সুন্দর স্বচ্ছ জলের হ্রদ এবং লক্ষ্মণজীর মন্দির। উচ্চতা : ৪৬৩৩ মিটার। আবহাওয়া : জুলাই ২য় সপ্তাহ থেকে সেপটেম্বরের শেষ সপ্তাহ।

ফুলের উপত্যকা বা ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস-এর স্থানীয় নাম বাম্‌নিধর বা কুণ্ডলিয়া সাঁই। চামোলি জেলার ভিয়ানডার উপত্যকায় অবস্থিত। হিমালয়ে ছুটি কাটাবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা। এই নন্দনকানন বহু উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর স্বপ্নরাজ্য। অজানাকে জানার জন্যে আজও তাঁরা এখানে ছুটে আসেন। ১৯৩১ সালে কামেৎ অভিযানের সময় এর কথা সবিশেষ জানা যায়। অভিযানের নেতা এফ এস স্মিথ এই নন্দন-কানন আবিষ্কার করার পর আবার ফিরে আসেন ১৯৩৭ সালে এবং নানারকম ফুল, বীজ প্রভৃতি ২৫০টি নিদর্শন সংগ্রহ করেন। তিনি 'ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস' নামে একটি বইও লেখেন।

কী ভাবে যাওয়া যায় : হৃষীকেশ—যোশীমঠ—গোবিন্দঘাট ২৭১ কিলোমিটার বাসে করে (গোবিন্দঘাট : উচ্চতা ১৮২৬ মিটার। থাকার জায়গা : গুরুদোয়ারা ফরেস্ট লগ কেবিন। কুলি এখান থেকেই মিলবে।)

ভ্রমণসূচী

১ম দিন গোবিন্দঘাট (হাঁটাপথে)	১৪ কিমি ঘ্যাংগ্রিয়া (৩০৪৮ মিটার)	রাত্রিবাস : গুরুদোয়ারা, ট্রাভেলার্স লজ, ফরেস্ট রেস্ট হাউস
২য় দিন ঘ্যাংগ্রিয়া (হাঁটাপথ)	৬ কিমি ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স (৩৬৫৮—৩৯৬২ মি)	উপত্যকায় তাঁবু ফেলে থাকা যাবে। যোশীমঠ থেকে তাঁবু এবং খাবার জিনিসপত্র আনতে হবে।
৩য় দিন ঘ্যাংগ্রিয়া	৫ কিমি হেমকুণ্ড (৪৮৩৩ মি)	ঘ্যাংগ্রিয়ায় ফিরে রাত্রিবাস করতে হবে।
৪র্থ দিন ঘ্যাংগ্রিয়া (পায়ে হাঁটা পথ)	১৪ কিমি গোবিন্দ ঘাট	(বাসে বদিরনাথ)

রিজার্ভেশন : গোবিন্দঘাটের লগ কেবিন আর ঘ্যাংগ্রিয়ার ফরেস্ট রেস্ট হাউসের জন্যে—
ডি এফ ও, বদরিনাথ ডিভিশন, গোপেশ্বর জেলা, চামোলি, উত্তর প্রদেশ ॥
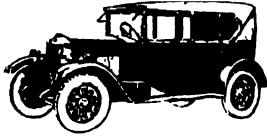
রূপকুণ্ড হোমকুণ্ডের পথে

১৬০০০ ফুট উঁচুতে ছোট্ট বরফ-গলা জলের একটি হ্রদ। তারই নাম রূপকুণ্ড। নামটা অকারণে হয়নি। এমন রূপবান হ্রদ বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। পুরাণকথা, গঙ্গাদেবী এই হ্রদের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। সেই থেকে এর নাম রূপকুণ্ড। এছাড়াও, মন্দাকিনীর শাখানদী রূপগঙ্গা বা রূপকিনির জন্মও এই রূপকুণ্ড থেকে। বছরের পর বছর, অভিযাত্রী দলকে এই সুদুঃসহ স্বর্গরাজ্যে টেনে এনেছে এই কুণ্ড ও তার পরিপার্শ্ব। পাহাড়-চড়িয়ে লোকজনও শ'য়ে শ'য়ে ধেয়ে এসেছে।

আধুনিক পর্যটকগণ এর রূপের কথা শুনে যেমন আসেন, তেমনি আসেন ৫/৬ শ বছরের পুরনো রোমাঞ্চকর এক গল্প শুনে। গল্পটি হলো, এই কুণ্ডের পাশে একসময় বেশ কিছু মানুষ, তীর্থযাত্রী হওয়াই সম্ভব, এসে মারা গিয়েছিলেন। ইচ্ছা মৃত্যুর জন্যে এই জায়গাটি তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন কি? নাকি কোনো অজ্ঞাত কারণে এই জীবনহানি? কিছুই সঠিক জানা যায় না। তাঁদের কঙ্কাল হাড়গোড়, সঙ্গের জিনিসপত্র সব এখনো বর্তমান। পর্যটককে এই ধ্বংসস্তূপ অকারণেই টানে, মৃত জীবিতকে যেমন করে টানে, ঠিক তেমন ভাবে। কিংবা স্বপ্ন যেমন ঘুমহীনকে। এখান থেকে ত্রিশূল (২৩৪৬০ ফুট) আর নন্দাঘুটি (২০৭০০ ফুট) স্পষ্ট দেখা যায়।

এখান থেকে ১০ মাইল হোমকুণ্ডি বা হোমকুনি। স্থানীয় পাহাড়িদের কাছে অতি পবিত্র স্থান। হোমকুণ্ডির উচ্চতা হবে ১৩২০০ ফুট। ১১ থেকে ২৪ বছরের ব্যবধানে রাজ জাত যোগ বা বড়ি নন্দাজাত যোগ আসে। তখন কর্ণপ্রয়াগের কাছের গ্রাম নাউটি

থেকে তীর্থযাত্রীদের যাত্রা শুরু হয়। শেষ হয় হোমকুণ্ডিতে এসে। নন্দাদেবীর পূজা হলো উপলক্ষ। স্থানীয় বিশ্বাস, নন্দাদেবী শিব-উপাসনায় এখানেই হোম করেছিলেন ও 'কুণ্ডি' অর্থাৎ চিতা জ্বালিয়ে। এখান থেকে দু মাইল এগিয়ে হোমকুণ্ড (১৫৯০০´)। পর্যটকগণ পায়ে হেঁটে এখানে পৌঁছুতে পারেন। তবে মোটেই অনায়াসে নয়। স্থানীয় লোক সঙ্গে নেওয়া জরুরী। পাহাড়ের হাতছানি পদে পদে পথ ভোলাবে। একটা দিনেই গিয়ে ফিরে আসা যায়।

গোটা পথ জুড়ে আছে উপত্যকা, নদীতীর, বনভূমি আর সবুজ ঘাসে-ছাওয়া প্রান্তরের পর প্রান্তর। আর আছে অসংখ্য অজস্র ফুল। কী তার রঙবাহার! কী তার স্বর্গীয় সুষমা! বিখ্যাত ব্রহ্মকমল পর্যন্ত ফুটে আছে! পথের শেষ দিকটায় অবশ্য এ সমস্তই কমে আসছে। ক্রমশ কমছে। তার বদলে বাড়ছে বড় বড় পাথরের গোলা, বরফ আর পাথরের খাঁজে দলাপাকানো টেনে-আনা জঞ্জাল। যতো এগিয়ে যাওয়া, ততোই চড়াই। পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকা অত্যন্ত জরুরী এবং হোমকুণ্ডি ও হোমকুণ্ডের জন্যে সঙ্গে তাঁবু। রূপকুণ্ডে ততো দরকারি নয়। চড়াই-পথে খাবার মিলবে না। পথিককে নিজের ব্যবস্থা নিজেই আগেভাগে করে, সঙ্গে রাখতে হবে। কুলি আর গাইড গোয়ালদাম আর ওখানে পাওয়া যাবে।

যাওয়া কী ভাবে

রেলপথে : হাওড়া থেকে কাঠগোদাম (১৬০০০´)

বাসে : কাঠগোদাম থেকে গোয়ালদাম* (৬৫০০´)।

থাকার জায়গা : বনবিভাগীয় বাংলো এবং ট্যুরিস্ট বাংলো।

* গোয়ালদাম থেকে ত্রিশূল আর নন্দাঘুণ্টির দৃশ্য অপরূপ। ঋষিকেশ—কর্ণপ্রয়াগ হয়েও গোয়ালদাম পৌছুনো যায় বা কোদোয়ারী—পাউরি—কর্ণপ্রয়াগ হয়ে।

হাঁটাপথে : গোয়ালদাম থেকে রূপকুণ্ড ৪৩½ মাইল
রূপকুণ্ড থেকে হোমকুন্তি ১০ মাইল
হোমকুন্তি থেকে হোমকুণ্ড ২ মাইল

ট্রেকিং করতে হলে

১ম দিন গোয়ালদাম থেকে দেবাল গ্রাম (৪৪২৫′) ৭ মাইল দূরত্ব দুপুরে বিশ্রাম : বনবাংলো
[দোকান আছে]
দেবাল থেকে মানডোলি (৭০০০′) ৮ " " রাত্রিবাস : বাংলো আছে

২য় দিন মানডোলি থেকে ওয়ান (৮০০′)
[ভায়া লোহাজং ৯০০০′/ ½ মা] ৯ " " সঙ্গে খাবার : রাত্রিবাস বনবাংলোয়

৩য় দিন ওয়ান থেকে আলবুগিয়াল (১২০০০′) ৭ " " রাত্রিবাস : ধর্মশালা ৬/৭ জন
বা ভেদিনিবুগিয়াল (১২০০০′)

৪র্থ দিন অলিবুগিয়াল বা ভেদিনি
থেকে বাগুয়াবাসা (১৪৫০০′)

[ভায়া পাটরনাচুনি ১৩০০০′ ৮ মাইল ৯ মাইল ধর্মশালা ৩/৪ জন এবং কৈলু বিনায়ক ৪০০০′, ১ মাইল]

৫ম দিন বাগুয়াবাসা থেকে রূপকুণ্ড (১৫০০০)	৩½ মাইল	
(ভায়া হুনিয়াথর ১৫০০০/২ মাইল]		
রূপকুণ্ড থেকে শিলাসমুদ্র (১৪৫০০)	৬½ ,,	তাঁবু
৬ষ্ঠ দিন শিলা সমুদ্র থেকে হোমকুণ্ড (১৩২০০)	৩½ ,,	,,
হোমকুণ্ডি থেকে হোমকুণ্ড (১৫৭০০)	২ ,,	,,
হোমকুণ্ড থেকে শিলা সমুদ্র (১৪৫০০)	৫½ ,,	,,
৭ম দিন শিলাসমুদ্র থেকে বাগুয়াবাসা	১০ ,,	রাত্রিবা:
৮ম দিন বাগুয়াবাসা থেকে ওয়ান (ভায়া ভেদনিবুগিয়াল)	১৬ ,,	,,
৯ম দিন ওয়ান থেকে মানডোলি	৯ ,,	,,
১০ দিন মানডোলি থেকে গোয়াল দাম	১৫ ,,	,,

অন্যান্য ট্রেকিং

১। ওয়ান—কাওয়ারি গিরিপথ-যোশীমঠ

ওয়ান থেকে কুনোল ৬ মাইল

২। কিংবা, ওয়ান—আউলি—ভেদিনি—ডুনা—কুনোল ২১ মাইল

কুনোল	থেকে	রামনি	৯ মাইল	রাত্রিবাস	বাংলো
রামনি	,,	সেমখারক	৬ ,,	,,	,,
সেমখারক	,,	কালিয়াঘাট	৮ ,,	,,	তাঁবু
কালিয়াঘাট	থেকে	কুয়ারিপাস (১২১৪০´)	৫ ,,	,,	,,
কুয়ারিপাস	,,	তপোবন	১৫ ,,	,,	,,
তপোবন	,,	যোশীমঠ	৮ ,,	বাসে করে।	পূর্ত বিভাগের বাংলো

৩। ওয়ান—ব্রহ্মতাল—বেগুনতাল—খারালি

ওয়ান থেকে ব্রহ্মতাল (১০০০০´) ১০ মাইল

ব্রহ্মতাল ,, খাপলুতাল [ভায়া বেগুনতাল] ৫ মাইল রাত্রিবাস তাঁবু

খাপলুতাল থেকে খারালি গ্রাম ১৮ মাইল। বাসরাস্তায় বনবাংলো

কনডাকটেড ট্যুরের জন্যে

১। যাত্রা ম্যানেজার গাড়োয়ল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিঃ মুনি-কি-রেতি, হৃষীকেশ, উত্তর প্রদেশ

২। ট্রেক-ও-ট্যুর, জি বি পন্থ মার্গ, নৈনিতাল, উত্তর প্রদেশ

বাংলো রিজার্ভেশনের জন্যে

১। ফরেস্ট বাংলো : গোয়ালদাম। জেলাশাসক, চামোলি ওয়ান। ডি এফ ও, গোপেশ্বর, জেলা-চামোলি

২। ট্যুরিষ্ট রেষ্ট হাউস : গোয়াল দাম। যাত্রা ম্যানেজার, গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিঃ

রাস্তার অবস্থা জানার জন্যে

১। রিজিওনাল ট্যুরিষ্ট অফিসার, গাড়োয়াল রিজিয়ন, পাউরি, জেলা গাড়োয়াল

২। রিশেপশনিস্ট, ট্যুরিষ্ট ব্যুরো, আলমোড়া

রূপকুণ্ড/হোমকুণ্ডর জন্যে রেজিস্টার্ড গাইড

১। বীর সিং। গ্রাম পূর্ণা, পোঃ দেবল; জেলা চামোলি ভায়া গোয়ালদাম

২। কেদার সিং। গ্রাম ওয়ান, পোঃ মানডোলি, জেলা চামোলি

৩। নারায়ণ সিং। গ্রাম দেবল, পোঃ ওয়ান

৪। রণজিৎ সিং। গ্রাম দিদনা, পোঃ মানডোলি

পিণ্ডারি হিমবাহ বা পিণ্ডারি গ্লোসিয়ার

হিমবাহ দেখতে যাবার অনুকূল সময় : মে, জুন, সেপটেমবর, অকটোবর।

কিভাবে যেতে হবে :

(১) রেলে হাওড়া থেকে কাঠগোদাম

(২) বাসে কাঠগোদাম থেকে বাগেশ্বর
(ভায়া আলমোড়া) ১৮১ কিমি
বাগেশ্বর থেকে ভারারি (কাপকট) ২২ কিমি
(জেলাপরিষদের বাংলো)

(৩) পায়ে হেঁটে কাপকট থেকে পিণ্ডারি ৬০ কিমি

বিঃ দ্রঃ (১) কাপকট পার হলে আর খাবার পাওয়া যাবে না। ফলে সঙ্গে খাবার থাকা দরকার

(২) খচ্চর, কুলি এবং গাইড কাপকট (ভারারি) থেকে নিতে হবে।

দিন	পথ	দূরত্ব	
১ম দিন	ভারারি/কাপকট থেকে লোহারক্ষেত	১৬ কিমি	রাত্রিবাস : পূর্তবাংলো
২য় দিন	লোহারক্ষেত থেকে ধাকুরি	১০ ,,	দুপুরে বিশ্রাম
	ধাকুরি থেকে খাটি	১০ ,,	রাত্রিবাস : পূর্তবাংলো
৩য় দিন	খাটি থেকে দোয়ালি	১১ ,,	দুপুরে বিশ্রাম
	দোয়ালি ,, ফুরকিয়া	৫ ,,	রাত্রিবাস : পূর্তবাংলো
৪র্থ দিন	ফুরকিয়া ,, পিণ্ডারি 'ও' পয়েন্ট	৮ ,,	
	পিণ্ডারি 'ও' পয়েন্ট থেকে ফুরকিয়া	৮ ,,	দুপুর
	ফুরকিয়া থেকে দোয়ালি	৫ ,,	রাত্রিবাস : পূর্তবাংলো
৫ম দিন	দেয়ালি থেকে কাকনি গ্লোসিয়ার	১২ ,,	রাস্তা নেই। গাইড জরুরী। সঙ্গে সুকনো খাবার নিতে হবে
	কাকনি থেকে দোয়ালি	১২ ,,	রাত্রিবাস : পূর্তবাংলো
৬ষ্ঠ দিন	দোয়ালি থেকে খাটি	১১ ,,	দুপুরে বিশ্রাম
	খাটি ,, ধাকুরি	১০ ,,	রাত্রিবাস : পূর্তবাংলো
৭ম দিন	ধাকুরি ,, লোহারক্ষেত	১০ ,,	দুপুর
	লোহারক্ষেত থেকে কাপকট	১৬ ,,	রাত্রিবাস : পূর্তবাংলো

রিজার্ভেশনের জন্যে

(১) **বাগেশ্বর জেলা পরিষদের বাংলোর জন্যে, একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, জিলা পরিষদ, আলমোড়া**

(২) **পি ডবলু বাংলোগুলোর জন্যে একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, কনসট্রাকশন ডিভিশন, পি ডবলু ডি, বাগেশ্বর।**

কেদারনাথ বদ্রীনাথ

কেদারনাথ

উচ্চতা ১১, ৭৫০ ফুট। নভেমবর থেকে এপরিল তুষারাবৃত। মে-অক্টোবর সীজন। মন্দির প্রতিবছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে খোলা হয়।

কেদারনাথ পৌঁছুবার ছুটি রাস্তা: হৃষীকেশ—শোণপ্রয়াগ (রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে) সরাসরি বাসে ২০৯ কিলোমিটার। শোণপ্রয়াগ কেদারনাথ [হাঁটাপথে ১৮ কিমি, ১১½ মা.)

(২) কোদোয়ারা-শোণপ্রয়াগ (ভায়া শ্রীনগর এবং রুদ্রপ্রয়াগ) বাসে ২৩৬ কিমি

রেল: সবচেয়ে কাছের রেলষ্টেশন হৃষীকেশ আর কোদোয়ারা। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত বড় সহরের সঙ্গে রেলযোগাযোগ আছে। ডুন একসপ্রেস হাওড়া-হরিদ্বার এবং মুসৌরি একসপ্রেস দিল্লী—হৃষীকেশকে যুক্ত করছে।

বাস: উত্তর প্রদেশ রাজ্য পরিবহন করপোরেশনের বাস ইউপির মূল শহরগুলো থেকে নিয়মিত হরিদ্বার—দেরাদুনের সঙ্গে যোগ রাখে। দেরাদুন থেকে গোপেশ্বর এবং নাজিবাবাদ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ভায়া ল্যানসডাউন, পাওরি আর শ্রীনগর—বাস। ৩০/৪৫ মিনিট বাদেবাদেই হরিদ্বার—হৃষীকেশ আর নাজিবাবাদ—কোদোয়ারা বাস আছে। আর কোদোয়ারা থেকেও শোণপ্রয়াগে যাবার বাস আছে।

বাসভাড়া। (১) হৃষীকেশ—শোণপ্রয়াগ ২০৯ কিমি ৩১.৫৫ (আপার ক্লাস)
২২.০৫ (লোয়ার)

(২) শোণপ্রয়াগ—বদ্রীনাথ ২২৬ কিমি ৩৩.৩০ (আপার)
২৩.১০ (শোফার)

(৩) হৃষীকেশ—বদ্রীনাথ ৬০১ কিমি ৪৫.৪৫ (আপার)
৩১.৯৫ (লোয়ার)

দেবপ্রয়াগ (৫১৮ মিটার) বাসে ৭১ কিলোমিটার	থাকার জায়গা পূর্তবিভাগ বনবিভাগ ছাড়া ট্যুরিস্ট বাংলো আর ধর্মশালা	অলকনন্দা আর ভাগীরথীর সঙ্গম। রামশিবের মন্দির।
শ্রীনগর (গড়োয়াল) বাসে ১০৭ কিমি	পূর্তবাংলো, বনবাংলো, চটি, ধর্মশালা	অলকনন্দাধারে কমলের মহাদেব ও বিষ্ণু মন্দির।
রুদ্রপ্রয়াগ বাস ১৪১ কিমি	পূর্ত ও বনবাংলো ধর্মশালা	অলকনন্দা ও মন্দাকিনী সঙ্গম। রুদ্রনাথ মন্দির। এখান থেকে কেদার-বদরী পথ আলাদা হয়ে গেছে।

গুপ্তকাশী বাস ১৮. কিমি		পূর্তবাংলো, মন্দির অতিথিশালা, চটি, তাঁবু	শংকর ও বিষ্ণুমন্দির। মন্দাকিনী আর সোনগন্দরে সঙ্গম। ত্রিযুগীত্রারায়ণ বাস টার্মিনাস (৫ কিমি) এর জন্যে পথ আলাদা।
শোণপ্রয়াগ—গৌরীকুণ্ড	হাঁটাপথ ৫ কিমি	চটি, তীর্থশালা	গৌরীদেবী মন্দির। উষ্ণ প্রস্রবন।
গৌরীকুণ্ড—জঙ্গল চটি	,, ৭ ,,	চটি	
জঙ্গলচটি—রামওয়ারা	,, ১৩ ,,	,,	
রামওয়ারা—কেদারনাথ	,, ১৮ ,,	,,	
কেদারনাথ—(৩৫৮১ মিটার)	,, ১৮ ,,	মন্দিরঅতিথিশালা, হোটেল হিমলোক, কেদারনাথ মন্দির ট্রাভেলারশ লজ, ধর্মশালা	

বদ্রীনাথ

উচ্চতা ৩১২২ মিটার (১০২৫০ ফুট) ঋষিগঙ্গা এবং অলকনন্দা নদীসঙ্গমে দূরে নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ দুদিকে আর পাহাড়শ্রেণী—নর এবং নারায়ণ। নদীতীরের কাছেই তাপ্তকুণ্ড—উষ্ণ প্রস্রবণ এবং সাড়ে চার কিমি উত্তরে ভয়ংকরী বসুধারা জলপ্রপাত।

যাতায়াত : রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত কেদারনাথ যাত্রার মতন। তার পরবর্তী পথ বিবরণ সংক্ষেপে—

রুদ্রপ্রয়াগ	বাস ১৪২	কিমি পূর্ত,	বনবাংলো ও ধর্মশালা			
কর্ণপ্রয়াগ	বাস ১৭৪	,,	,,	,,	,,	পিণ্ডার এবং অলকনন্দা সঙ্গম। উমা ও কর্ণ মন্দির
নন্দপ্রয়াগ	বাস ১৯৫	,,	,,	,,		অলকনন্দা মন্দাকিনী সঙ্গম। গোপালজী মন্দির
চামোলি	বাস ২০৪	,,		,,		
বিরেহি	,, ২১২	,,		বনবাংলো		বিরেহি—অলকনন্দা সঙ্গম।

পিপালকোঁঠি	বাস	২২২ কিমি	পূর্ত এবং মন্দির অতিথিশালা, ধর্মশালা
যোশীমঠ	,,	২৫৩ ,,	,, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের আশ্রম
গোবিন্দঘাট	,,	২৭৫ ,,	গুরদোয়ারা, কাঠের ঘর ভ্যালী অফ ফ্লাওয়ারস এবং হেমকুণ্ড যাবার পথ।
পাণ্ডুকেশর	,,	২৭৮ ,,	পূর্ত, বন, মন্দির অতিথিশালা
বদ্রীনাথ	,,	৩০১ ,,	,, ,, ,, ,, এবং হোটেল দেবলোক।

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিঃ, মুনিকিরেতি, হৃষীকেশ—হৃষীকেশ থেকে ৭ দিনের বদরি কেদার এবং শুধু ৪ দিনের বদরিনাথ করে। প্রথমটার জন্যে ২৬৫·০০ এবং দ্বিতীয় ট্রিপে ১৯০·০০। খাদ্য ছাড়া সমস্ত ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ খরচ সর্বত্র মেলে। কলেরার টিকা নেবার পর প্রমাণপত্র সঙ্গে থাকা অবশ্য দরকার।

শিলং। খাসি, জয়ন্তীয়া, গারো পাহাড় অঞ্চল

শিলং-এ অজস্র হোটেল। নিরামিষ ভোজীদের জন্যে রেষ্টুরেণ্ট। তিন তারা বিশিষ্ট পাইনউড হোটেল বর্তমানে সরকার-পরিচালনাধীন। ভারতীয় ও পশ্চিমী খানা। পুরনো রেসকোরকের সামনে বড় বড় ট্যুরিষ্ট বাংলো। পরিচালনায় ট্যুরিষ্ট ডিপার্টমেন্ট, মেঘালয় সরকার।

শিলং পিকে ওঠার পথে-পিকলজ। তত্ত্বাবধানে পাইনউড হোটেল। উমিয়ম লেকে লেকভিউ কটেজ। খাসিপাহাড় অঞ্চলের সদর যেমন শিলং, তেমনি জয়ন্তিয়া পর্বতাঞ্চলের সদর দপ্তর জওয়াই। শিলং-জওয়াই যোগাযোগ সড়ক জাতীয় সড়ক, ৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। মেঘালয় রাজ্য পরিবহনের নিয়মিত বাস শিলং-জওয়াই রুটে চলে। ট্যাক্সিও আছে।

জওয়াই থেকে ধারে কাছে।

১। থাডলাসকিন হ্রদ : জওয়াই যেতে পথে এই মনোমুগ্ধকর হ্রদ। বোটিং-এর ব্যাস্থা আছে।

২। গরমপানি (উষ্ণ প্রস্রবন) জওয়াই থেকে পুবদিকে ৫৬ কিমি। কুপলি নদীর পাশে।

৩। নারটিয়াং (২৪ কিমি) পুরনো হিন্দু তীর্থ। অনেকগুলি পাথরের স্তম্ভ। সবচেয়ে বড় যেটি, সেটি ২৪ ফুট।

৪। সিনডাই গুহা (৩৫ কিমি) সুরক্ষিত গুহা, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় জয়ন্তীয়া রাজারা পরিবার পরিজনকে লুকিয়ে রাখতেন।

মাছ মারিয়েদের স্বর্গ ঃ মিনডু মিলটাং লুবা প্রভৃতি নদী। জয়ন্তীয়াদের প্রিয় খেলা হলো ষাঁড়ের লড়াই।

জওয়াই-এ থাকার ভালো জায়গা ইনসপেকশন বাংলো

জওয়াই-এর ডেপুটি কমিশনার-এর কাছে লিখে থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গারো পর্বতাঞ্চলের জেলা সদর টুরা। সমুদ্রপিঠ থেকে ৬৫৭ মিটার। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখা এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। টুরা শহর থেকে টুরা শিখর ৫ কিমি। গারোদের পূর্বপুরুষ তিব্বতের টোরুয়া প্রদেশের অধিবাসী।

গারো পর্বতাঞ্চলে বিশেষ বিশেষ দেখার জায়গা: বাঘমারা (১১৫ কিমি) নাফাক লেক (১১২ কিমি) বালপাকরাম (১৬৭ কিমি) এবং সিজু গুহা বা কেভ (১৫১ কিমি)। নাফাক হ্রদ মাছ ধরার জন্যে বিখ্যাত। বাঘমারা অন্যতম সুন্দর শহর। সিজু ডোবাক্কল গুহার জন্যে বিখ্যাত। রনগ্রেনগিরি (টুরা থেকে ৭৯ কিমি) ব্রিটিশদের সঙ্গে এইখানে গারোদের শেষ যুদ্ধ হয়। আরবেলা এবং রেসুবেলপাড়া অন্যতম দ্রষ্টব্য।

থাকার জায়গা:

১। সারকিট হাউস। রিজারর্ভেশন, ডেপুটি কমিশনার, টুরা

২। জেলা কাউনসিল সদস্যদের হসটেল। রিজারভেশন, সেক্রেটারি, ডিসট্রিকট কাউনসিল, টুরা।

৩। টুরিস্ট লজ, টুরা পিকের উপর। রিজারভেশন, টুরিস্ট অফিসার কিংবা ডি এফ ও, টুরা।

শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি ৫৩ কিলোমিটার। ভালো মোটর রাস্তা। মাওসমাই প্রপাত, মাওসমাই গুহা, কিনরেম প্রপাত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ইনসপেকশন বাংলো আছে। বারান্দা থেকে বাংলাদেশের ভূচিত্র। মাফলং মাত্র ২৪ কিমি।

নাগাল্যাণ্ড

১। ডিমাপুর। একটি সুন্দর ট্যুরিস্ট লজ আছে। নাগাল্যাণ্ডের সিং-দরজা এই ডিমাপুর শহর। খবরাখবর এবং বুকিং-এর জন্যে ট্যুরিস্ট অফিসার, ডিমাপুর, ফোন ৩৭৪।

২। এম এল এ হসটেল, কোহিমা। রিজারভেশন, সেক্রেটারি রাজ্য বিধান সভা।

৩। সারকিট হাউস, কোহিমা। রিজারভেশন, ডেপুটি কমিশনার, কোহিমা। এছাড়াও, অন্যান্য বহু ছোটবড় মাঝারি হোটেল কোহিমায় আছে।

হরিদ্বার

১। আনন্দ নিবাস, শ্রাবণনাথ ঘাট
২। আর্যনিবাস হোটেল, মোদিভবনের কাছে
৩। বাসদেব মাদরাজ হোটেল, রেলস্টেশনের গা
৪। গঙ্গা বিলডিং, হর-কি-প্যারী
৫। জ্ঞান নিকেতন, সুভাষ ঘাট
৬। জয়পুরিয়া হাউস, রামঘাট
৭। নাগোঁ-আলি-হাভেলি, সুভাষ ঘাট
৮। প্যালেস হোটেল, শ্রাবন নগর
৯। রয়াল হোটেল, গৌঘাট
১০। শান্তিনিকেতন, হর-কি-প্যারী
১১। যাত্রীনিবাস, মালব্য রোড

*১২ বিদেশবিক্রম হোটেল, কনকন রোড। এগুলি মাথাপিছু ১০—২০ টাকা ডবল ২০—৪০ টাকা

১৩ গুরুদেব হোটেল, রেলস্টেশনের কাছে

**১৪ সম্রাট, চিত্রা সিনেমার গায়ে, ** চার্জ মাথাপিছু ১৫ টাকার মতন। ডবল ঘরের জন্যে ২৫—৩০ টাকা

অন্যান্য থাকার জায়গা

১। ট্যুরিস্ট বাংলো, বেলওয়ালা, টেলি ৩৭৯। সিঙ্গল ১৫'০০ ডবল ২০'০০ ডরমিটরি ৫'০০ মাথাপিছু। রিজারভেশন : ট্যুরিস্ট অফিসার।

২। কানাল ড্যাম পরিদর্শন কেন্দ্র, মায়াপুর। ৩ এবং ৪ নম্বর স্যুইট

৩। লালজিওয়ালা ইনসপেকশন হাউস, লালজিওয়ালা। ৮'০০ ঘরপিছু। এস ডিও (কানালস) মায়াপুর।

৪। জেলা পরিষদ বাংলো, বাস স্ট্যানণ্ডের কাছে। ৫'০০ স্যুইট। প্ল্যানিং অফিসার, সাহারানপুর

৫। পি ডবলু ডি বাংলো। ভীমগোদা রোড। ৮'০০ স্যুইট।

৬। বনবাংলো, রাণীপুর, ৫'০০ টাকা দিনে। ডি এফ ও সাহারানপুর ফরেস্ট ডিভিশন।

৭। রেলের রিটায়ারিং রুম। ৬'০০ ডবল। স্টেশন মাষ্টার হরিদ্বার

ধর্মশালা

অমৃতসর, বাসন্তী দেবী, ভোলাগিরি আশ্রম, ভাতিণ্ডা বিকানীর ওয়ালী, বৃন্দাবন, ধ্যান দেবী, কালীকমলি, কর্নাটিক প্রভৃতি। থাকার খরচ নেই। ৫০ পয়সা বিজলী বাতির প্রতি পয়েনটে।

অন্যান্য ভাড়া বাড়ি

আম্বালা হাউস, বাতালা হাউস, ভাটিয়াভবন, গঙ্গাআশ্রম প্রভৃতি।

ইনফরমেশন সেন্টার : ট্যুরিস্ট ব্যুরো, লালতারাও ব্রিজ, হরিদ্বার টেলি ১৯

হৃষীকেশ

থাকার জায়গা। হোটেল

১। উত্তর প্রদেশ ট্যুরিস্ট বাংলো। মুনি-কি রেতি, টেলি ৩৭৫। সিঙ্গল ১০.০০ ডবল ১৫.০০ রিজার্ভেশন : ট্যুরিস্ট অফিসার

২। একাডেমি অব মেডিটেশন। শঙ্করাচার্য নগর, টেলি ১২১। সিঙ্গল ২৫—৭৫ টা. ডবল ৬০—১০০.০০ [খাওয়া থাকা সহ]

৩। পি ডবলু ডি পরিদর্শন বাংলো। হরদোয়ার রোড। ৮.০০ ঘরপিছু

রিজার্ভেশন : একজি, ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি (প্রভিনসিয়াল), দেরাদুন

৪। ফরেস্ট রেস্ট হাউস। মুনি-কি-রেতি, টেলি ৫৪। ৮.০০ স্যুইট পিছু

রিজার্ভেশন : ডি এফ ও, তেহরি কিংবা কনজারভেটর অব ফরেস্টস, তেহরি সার্কল, দেরাদুন

ধর্মশালা : প্রথম শ্রেণী

অনধ্র আশ্রম, বাবা কালিকমলি, জয়রাম, অন্নক্ষেত্র, পানজাব সিনধ ক্ষেত্র, শিবানন্দ আশ্রম, শ্রী ভোল আশ্রম।

দ্বিতীয় শ্রেণী : ভগবান আশ্রম, গোপাল কুঠি, গীতা ভবন, পরমার্থ নিকেতন, সাহারানপুরওয়ালী, এবং স্বর্গাশ্রম।

যাবার জায়গা

বদরিনাথ (২৯৩ কিমি), দেরাদুন (৪৫ কিমি), গঙ্গোত্রী (২৫০ কিমি), হরদোয়ার (২৪ কিমি) কেদারনাথ (২২৪ কিমি), মুসৌরি

(৭৯ কিমি), নরেন্দ্রনগর (১৬ কিমি), নীলকণ্ঠ (১৬ কিমি), শ্রীনগর (১০৭ কিমি), উত্তরকাশী (১৫৪ কিমি), যমুনোত্রী (২২৬ কিমি)। এখানে মদ্যপান নিষেধ। মাছ মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ।

মুসৌরি

মুসৌরি—দেরাদুন	২২ মাইল	
মুসৌরি—সাহারানপুর	৬৪	"
মুসৌরি—দিললি	১৬৯	"
মুসৌরি—চাকরাতা	৫০	"
মুসৌরি—তেহরি	৪৫	"
মুসৌরি - বারকোট	৫৮	"

থাকার জায়গা

১। পি ডবলু ইনসপেকশন হাউস (প্রভিনসিয়াল) কার্লোভিল রোড
রিজার্ভ: একজি ইনজিনিয়ার (প্রভঃ), দেরাদুন

২। পি ডবলু ইনসপেকশন হাউস (সেনট্রাল) কাসল হিল এসটেট
রিজার্ভ: একজি ইনজিনিয়ার (সেনট্রাল) দেরাদুন

৩। ট্যুরিস্ট হোম। ক্যামেল ব্যাক রোড
রিজার্ভ: একজিকিউটিভ অফিসার, সিটি বোর্ড মুসৌরি।

	পশ্চিমী কায়দার হোটেল		মাথ পিছু/ঘর পিছু	ফোন
১।	স্যাভয় হোটেল।	লাইব্রেরি বাজার	৫৬ টাকা—১৯৫ টাকা	৫১০
২।	হার্কমেনস হোটেল।	দি মল।	৪০.০০—৬৫.০০	৫৫৯
	ভারতীয় কেতার হোটেল			
১।	রোয়ানক হোটেল।	পিকচার প্যালেসের কাছে।	১৪.০০—২৮.০০	২১৫
২।	লাইব্রেরি ক্লাব।	লাইব্রেরি বাজার।	৫.০০—৩৬.০০	২৯৭
৩।	ইমপিরিয়াল।	” ।	৫.০০—২৫.০০	
৪।	ইনডিয়া।	” ।	৫.০০—২৫.০০	৩৫৯
৫।	আদর্শ হোটেল।	” ।	৫.০০—২০.০০	৩৪৫
৬।	কাশ্মীর হোটেল।	” ।	১৯.০০—৬৬.০০	৬১৬
৭।	প্রিনস হোটেল।	” ।	১২.০০—৫০.০০	৬৭৪
৮।	ব্রেনট উড হোটেল।	কুলরি বাজার।	১০.০০—৩৫.০০	৫৩৬
৯।	সেনট্রাল।	” ।	২০.০০—৫০.০০	৩২৬
১০।	কনট ক্যাসল।	” ।	৬.০০—৫৮.০০	৫৫৮
১১।	ওয়ালনাট গ্রোভ।	।	৬.০০—৫৮.০০	৪৫৮

			মাথা পিছু/ঘর পিছু	ফোন
১২।	দ্রুনভিউ হোটেল	”	১৮.০০—৩৬.০০	৫৬৬
১৩।	এভারেস্ট।	”	১২.০০—৪০ ০০	৬০১
১৪।	রক্সি হোটেল।	”	৫.০০—৪০.০০	২৭৯
১৫।	মুসৌরি ক্লাব।	”	৩.০০ - ৩৮ ০০	
১৬।	সিলভারটন।	কুলরিবাজার	৮.০০—৪০.০০	৩১২
১৭।	রিগ্যাল।	”	১৩ ০০—১৫.০০	২৫০
১৮।	নন্দভিলা।	”	১২ ০০—৫৫.০০	৪৪২
১ ।	মিনারভা।	”	১৫.০০—৫০.০০	২৮৬
২০।	নবীন হোটেল।	”	৮.০০—২৪.০০	৫৭৩
২১।	প্লাজা হোটেল।	”	১২.০০—৪০.০০	৫৪০
২২।	ট্যুরিষ্ট হোটেল।	”	৮.০০—৪০ ০০	
২৩।	নিউ ভারত হোটেল।	”	৫.০০—৫০ ০০	
২৪।	ওয়াই ডবলু সি এ।	দি মল	১০.০০—১৬.০০	৫১৩
২৫।	লথস্মনট হোটেল।	”	৩.০০—৪৫.০০	
২৬।	হিমালয় ক্লাব।	সিটি বোর্ডের কাছে	৩.০০—৫২.০০	৫৪৫

			মাথা পিছু/ঘর পিছু	ফোন
২৭।	মুল্লিনগর হোটেল।	ল্যানডুর	২.০০—১০.০০	৬৩৮
২৮।	গণেশ হোটেল।	"	৫.০০—১৫.০০	৬১৯
২৯।	ব্রডওয়ে।	ক্যামেলসব্যাক	১৮.০০—৩০.০০	২৪৩
৩০।	হেভেনশ ক্লাব।	পিকচার প্যালেস	৫.০০—৩০.০০	

লুম্বিনি

লুম্বিনিতে যেতে গেলে বিমানযাত্রীদের পক্ষে বারানসী বা লখনৌ যাওয়া সুবিধা জনক। তারপর রেলে নওগড়। নেপাল থেকে মোটর যোগে। বেশ কিছুটা হেঁটেও যেতে হবে।

বারানসী এবং লখনৌ এর সঙ্গে নিয়মিত বিমান যোগ আছে—দিললি, আগ্রা, কলকাতা, কাঠমাণ্ডু, খাজুরাহো এবং পাটনার সঙ্গে।

৩৫ কিমি বাসরাস্তা। উত্তর প্রদেশ রাজ্য পরিবহনের বাস নিয়মিত নওগড় আর লুম্বিনির মধ্যে আসা যাওয়া করে।

থাকার জায়গা/লুমবিনিতে

১। নেপাল সরকারের অতিথিশালা ১৪টি ঘর/২টি হল ঘর থাকার খরচ নেই/খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের

সংরক্ষণ : ম্যানেজার, নেপাল সরকার অতিথিশালা, লুম্বিনি।

২। ট্যুরিস্ট হোটেল ১২টি ঘর ৪.০০ শয্যাপিছু পানশালা/রেস্টুরেন্ট আছে

থাকার জায়গা/নওগড়ে

১। পি ডবলু ডি ইনসপেকশন বাংলো ৪-ঘরা ১.৫০ ঘর পিছু দিনে।খাবার নেই

সংরক্ষণ : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র পি ডবলু ডি, নওগড়, বাস্তি

২। মহাবোধি সোসাইটি রেস্ট হাউস ৪-ঘরা থাকার খরচ নেই।খাবার নেই

সংরক্ষণ : সেক্রেটারি, ম. বো. সো. নওগড়

৩। বর্মিজ ধর্মশালা থাকার ব্যবস্থা ভালো/খাবার নেই

দ্রষ্টব্য

অশোক স্তম্ভ, মায়াদেবীর মন্দির, পুরনো মোনাস্টেরির ধ্বংসাবশেষ এবং নতুন কিছু স্তূপ। ইনফরমেশন সেনটার, নেপাল সরকার, লুম্বিনি

শ্রাবস্তী বা সাহেত মাহেত

কোশলের প্রাচীন রাজধানী। এখানেই অবিশ্বাসী এবং অধার্মিকদের বুদ্ধদেব তাঁর মহিমা প্রদর্শন করেন। তিনি সহস্রপত্রী পদ্মে উপবেশন করে নিজেকে লক্ষ বুদ্ধমূর্তিতে প্রকাশিত করেন। জল এবং অগ্নি যুগপৎ তাঁর দেহ থেকে নির্গত হয়। রাজা প্রসেনজিৎসহ সহস্রাধিক দর্শক হতভম্ব।

শ্রাবস্তীতে এখন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই। এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান এই শ্রাবস্তীতেই শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিকা প্রভুর পায়ে প্রচুর পরিমান স্বর্ণমোহর উপহার দেন, যাতে বিশালায়তন মোনাস্টেরি তৈরি হয় রাজকুমার জেতার বাগানে। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত।

কীভাবে যেতে হবে ?

উত্তরপূর্ব রেলের বলরামপুর রেলস্টেশন থেকে ২১ কিমি মোটরপথে। বলরামপুর-সাহেত-মাহেত বাস চলাচল করে। এক্কা আছে। সাইকেল রিকশাতেও যাওয়া যায়।

প্লেনে লখনৌ। সেখান থেকে গোনডা হয়ে বলরামপুর।

থাকার জায়গা

১। সাহেত-মাহেত পি ডবলু ডি ইনসপেকশন বাংলো। রিজার্ভেশন: একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র, পি ডবলু ডি, বলরামপুর	২টি স্যুইট	২.০০ স্যুইট পিছু দিনে বিজলী আছে/খাবার ব্যবস্থা নেই

২। বর্মী মন্দির অতিথিশালা/বর্মী তীর্থযাত্রীদের জন্য রিজার্ভেশন : প্রধান পুরোহিত : অতিথিশালা সাহেত-মহেত	৪-ঘরা, ১ হল ভাড়া নেই/বিজলী নেই/খাবার নেই
৩। চীনা মন্দির অতিথিশালা। রিজার্ভেশন : প্রধান পুরোহিত চী. ম. অতিথিশালা, সাহেত-মাহেত	১ হল ঘর ভাড়া নেই/বিজলী নেই/ খাবার নেই/বিছানা নেই
৪। জৈন ধরমশালা রিজার্ভেশন : জৈ. ধ কেয়ার টেকার, সাহেত মাহেত	১০টি হল ঘর ভাড়া নেই/বিজলী নেই/খাবার নেই
৫। বলরামপুর পি ডবলু ডি ইনসপেকশন হাউস। রিজার্ভেশন : এ্যাসিঃ ইনজিনিয়র পি ডবলু ডি, বলরামপুর	২টি স্যুইট ২.৮৮ পয়সা স্যুইট পিছু দিনে/ খাবার ব্যবস্থা নেই
৬। রাজ গেস্ট হাউস, ম্যানেজার রাজ গেস্ট হাউস, বলরামপুর	৮টি শয্যা ৮.০০—১০.০০ দিনে/রান্নার ব্যবস্থা আছে
৭। মহারানী সাহেবা ধরমশালা রিজার্ভেশন : সেক্রেটারি : মহারানী সাহেবা ধর্মশালা, বলরামপুর	১৪টি ঘর, ২টি হল ঘর ২৪টি ঘর নিচ তলায়—৭ টাকা ঘর পিছু ১০টি ঘর ওপর তলায়—১০ ,, ,, ,,

৮। বর্মী ধর্মশালা (বর্মী তীর্থযাত্রীদের জন্য সেক্রেটারি ধর্মশালা, বলরামপুর — ১০ ঘর, ২ হল ঘর। ভাড়া নেই/বিজলী আছে/খাবার নেই

অবশ্য দ্রষ্টব্য : জেতবনবিহার, সংঘারামের ধ্বংসস্তূপ, কৌশাম্বী কুঠি, মহামূলাগন্ধা কুঠি এবং স্তূপ, আনন্দ বোধিবৃক্ষ, প্রাচীন শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ এবং সাম্প্রতিক চীনা-বর্মী মন্দির।

পিণ্ডারি গ্লোসিয়ার বা পিণ্ডারি হিমবাহ

পিণ্ডারি গ্লোসিয়ার নন্দাদেবী এবং অন্যান্য পর্বতের কাছে ঋনী। এর সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এখানে আসার উপযুক্ত সময় মে-জুন এবং সেপটেম্বর—অকটোবর। রেলপথে হাওড়া থেকে কাঠগোদাম। কাঠগোদাম থোক আলমোড়া হয়ে বাগেশ্বর। ১৮২ কিমি পথ। জেলা পরিষদের বাংলোয় রাত কাটাতে হবে। বাগেশ্বর থেকে ভারারি (কাপকট) ২২ কিমি। কাপকট থেকে পিণ্ডারি '০' পয়েন্ট ৬০ কিমি পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

কাপকটের পর খাবার-দাবার মিলবে না। আগে থেকেই সঙ্গে রাখতে হবে। ঘোড়া, কুলি এবং পথপ্রদর্শক কাপকটে (ভারারি) পাওয়া যাবে।

কীভাবে যাওয়া

দিন	থেকে		পর্যন্ত	দূরত্ব	মন্তব্য
১ম দিন	ভায়ারি/কাপকট থেকে (১০৮২ মিটার)		লোহারক্ষেত (১৭৫৩ মি)	১৬ কিমি	রাত্রিবাস :—পি ডবলু ডি ইনসপেকশন বাংলো
২য় দিন	লোহারক্ষেত	,,	ধাকুরি (২৬২১ মি)	১০ কিমি	দুপুরের বিশ্রাম
	ধাকুরি	,,	খাটি (২২১০ মি)	১০ কিমি	রাত্রিবাস :—পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো
৩য় দিন	খাটি	,,	দোয়ালি	১১ কিমি	দুপুরের বিশ্রাম
	দোয়ালি	,,	ফুরকিয়া (৩২৬১ মি)	৫ কিমি	পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো
৪র্থ দিন	ফুরকিয়া	,,	পিণ্ডারি '০' পয়েন্ট	৮ ,,	
		,,	(৩৩৫৩ মি)		
	পিণ্ডারি	,,	ফুরকিয়া	৮ ,,	দুপুর
	ফুরকিয়া	,,	দোয়ানি	৫ ,,	পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো
৫ম দিন	দোয়ালি	,,	কাফ্‌নী গ্লোসিয়ার	১২ ,,	গাইড জরুরী। ভালো রাস্তা নেই
	কাফ্‌নী	,,	দোয়ালি	১২ ,,	রাত্রিবাস

৬ষ্ঠ দিন	দোয়ালি	,,	খাটি	১১ ,,	দুপুরের বিশ্রাম
	খাটি	,,	ধাকুরি	১০ ,,	রাত্রিবাস পি ডবলু ইনস: বাংলো
৭ম দিন	ধাকুরি	,,	লোহারক্ষেত	১০ ,,	দুপুর
	লোহারক্ষেত	,,	কাপকট	১৬ ,,	রাত্রি : পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো

রিজার্ভেশন : (১) জিলা পরিষদ বাংলো, বাগেশ্বর, একজিকিউটিভ অফিসার, জিলা পরিষদ আলমোড়া, উত্তরপ্রদেশ

(২) পি ডবলু ডি বাংলোগুলোর জন্যে : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, কনসট্রাকশন ডিভিশন, পি ডবলু ডি, বাগেশ্বর, উত্তরপ্রদেশ।

নয়াদিললি :হোটেল	সিঙ্গল	ডবল
ওবেরয় ইনটার-কনটিনেনটাল	এসি ২২৫-২৭৫	৩২০-৩৭০
ডাঃ জাকির হুসেন রোড, টৌলি ৩৮৬১৬১		
ইনহোটেলকোর, টেলেকস ২৩৭২		
অশোকা		
৫০ বি, চাণক্যপুরী, টেলি ৩৭০১০১	,, ১৭৫	২৫০

টেলেকস ২৫৬৭			
আকবর			
চাণক্যপুরী, টেলি ৩৭০২৫১			
আকবোটেল টেলেক্স ২৮৬৩	,,	০৯২	২২৫
ইমপিরিয়াল			
জনপথ, টেলি ৩১১ ৫১১			
কমফরট, টেলেক্স ৭৩০৩	,,	১০৫	২১৫
ক্লারিজ			
১২ আওরঙ্গজেব রোড, টেলি ৩৭০২১১	,,	১২৫	২০৫
টেলেক্স ২৫১৮			
কুতব			
শ্রীঅরবিন্দ মার্গ থেকে কাছে, টেলি ৬৭৮০৩০	,,	১২০	১৯০
টেলেক্স ৩৬৩৭			
মেডেনস			
৭ আলিপুর রোড, দিললি	,,	১১০-১২৫	১৬০-১৮০
টেলি ২২১৫৯১ টেলক্স ৩৬৩৭			

জনপথ হোটেল	সিঙ্গল	ডবল	সারভিসচারজ
জনপথ, টেলি ৩৮৩৯৬১			
রেস্টওয়েল, টেলেক্স ২৪৬৮			
ডিপ্লোম্যাট			
৯ সরদার প্যাটেল মার্গ, টেলি ৩৮২০০৩	এসি ৮৫	১৫০-১৬০	১০%
টেলেক্স ২৫৩২			
প্রেসিডেন্ট			
৪।২৩ বি আসফ আলি রোড টেলি ২৭৭৮৩৬	,, ৮৫	১২০-১৩০	১০%
রাজদূত			
মথুরা রোড, টেলি ৭৯৫৮৩	,, ৯৫	১৪০	১০%
ওয়াই এম সি এ ট্যুরিস্ট হস্টেল	,, ৮০	১৩৫	১০%
জয়সিং রোড, টেলি ৩১১৯১৫	এসি নয় [illegible]০	৭৫	
বিক্রম			
রিং রোড, লাজপতনগর, টেলি ৬২৫৬৩৯	এসি ৭৫	১২০	১০%

লোধি				
লালা লাজপৎ রাই মার্গ, টেলি ৬১৯৪২২	,,	৭৫	১২০	
	এসি	৫৫	৯০	
রণজিৎ				
মহারাজা রণজিৎ সিং রোড, টেলি ২৭৫০২১	এসি	৭৫	১২০	
ইয়রক	,, নয়	৫৫	৯০	
কে ব্লক, কনট সারকাস, টেলি ৪৫৯০৬	,,	৬৫	১০০	
অ্যামবাসাডর				
সুজন সিং পার্ক, টেলি ৩৮৫৪৩১	,,	৬০-৭৫	১০০-১৩০	
ব্রডওয়ে				
আসফ আলি রোড, টেলি ২৭৩৮২১	,,	৬৫	১১৫	১০%
অলকা				
১৬/৯০ কনট প্লেস, টেলি ৩৪৪৩২৮	এসি	৫৬-৬৬	১০০	
মেটরো				
জনপথ, টেলি ৪৮৯০৫	,,	৪১	৬৩	
		৩৭	৫৫	

	সিঙ্গল	ডবল	
ম্যানর	[ব্রেকফাস্ট সহ]		১০%
৭৭ ফ্রেনডস কলোনি	৩৫-৪৫	৭০-৮৫	
মথুরা রোড, টেলি ৬৩১০৮২	২৫-৩৫	৬০-৮০	৭%
টেম্বা			
২৮০২ বড় বাজার	২৫-৩৫	৭০-৫০	
কাশ্মীর গেট, দিললি, টেলি ২২১৫৭১			
ভগীরথ প্যালেস			
চাঁদনি চক, দিললি, টেলি ২৭৬২২৩	২৫.০০-৩০.০০	৫৫-৪৪	
ফ্লোরা			
দয়ানন্দ রোড, দরিয়াগনজ	[ব্রেকফাস্ট সহ]		
টেলি ২৭৩৬৩৪	এসি ২৮-৪৮	৭০	১০%
ওয়াই ডবলু সি এ			
ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস	” ৬০	৮২	
পার্লামেন্ট স্ট্রীট			

		সিঙ্গল	ডবল
টেলি ৩১১৯৮৯, ৩১১৫৬১			
শাকাহার			
দরিয়াগনজ, টেলি ২৭৩৫৩৭	এসি নয়	২০	৩৫
সাউথ ইনডিয়া বোরডিং হাউস			
এম ব্লক, কনট সারকাস, টেলি ৪৮৩৩৮	,,	১২	২০
কেশরী			
মেইন বাজার, পাহাড় গনজ, টেলি ২৭৬৪৪৮	,,	১০	১৫

অন্যান্য থাকার জায়গা

১। নতুন দিললি রেলস্টেশন (ঘর মাত্র) এসি সিঙ্গল ২৩.০০। ডবল ৩১.০০। এসি নয় ১০—২০, ২০—২৫। ডরমিটরি ৩—৫। রিজার্ভেশন ঃ স্টেশন সুপারিনটেনডেনট

২। পুরনো দিললি রেলস্টেশন ঃ এসি নয় ১০.০০। ডরমিটরি আছে। প্রধান টিকিট কালেকটরের কাছে বুকিং করতে হবে।

ক্যাম্প ফেলার মাঠ

১। ট্যুরিস্ট ক্যামপিং পারক। আরউইন হাসপাতালের বিপরীত। টেলি ২৭৮৯২৯

গাড়ি পার্ক করার জন্যে	২৪ ঘণ্টায়	৪.০০	ভাঁজকরা বিছানা	২৪ ঘণ্টায়	২.০০
তাঁবু এবং প্লাটফরম	,, ,,	১৩.০০	ফ্যান	,, ,,	২.০০
প্লাটফরম	,, ,,	৪.০০	সারভিস চারজ মাথাপিছু	,, ,,	১.২৫
শুধু তাঁবু	,, ,,	২.০০			

সর্বাধিক ৭ দিন থাকা যাবে। অনুসন্ধান : জোনাল ইনজিনিয়ার, সিটি জোন, মিন্টো রোড

২। ট্যুরিস্ট ক্যামপিং পার্ক। কুদসিয়া গারডেনস, ইনটার-স্টেট বাস টার্মিনালের বিপরীত কাশ্মীরী গেট, টেলি ২২২৮০১

৩। ইয়ুথ হসটেল। ডুরি ভাটিয়ারি কা মহল। লিংক রোডের কাছে, করলবাগ। সদস্যদের জন্যে ১.০০। সদস্য ছাড়া ২.০০

ধর্মশালা

১। পার্শি আঞ্জুমান। দিললি গেটের কাছে। বাহাদুর শাহ জাফর রোড। টেলি ২৭৪৫৮৮। শুধু পারশিদের জন্যে। ২০.৫০ মোট মাথাপিছু।

২। বুদ্ধিষ্ট পিলগ্রমেজ সেনটার চেমস ফোর্ড রোড। টেলি ৪৩২০৫। শ্রীলংকার বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর জন্যে। মাথাপিছু ৩.০০

৩। লাডাখ বুদ্ধ বিহার। বেলা রোড। টেলি ২২০৪৬৫। ৩'০০ ঘরপিছু

৪। মারোয়ারি পঞ্চায়েত ধর্মশালা। নয়ী সড়ক। টেলি ২৬৪০৮

৫। ভোলুমাল ধর্মশালা, চারখেন ওয়ালান, চৌরি বাজার

৬। ভূপীন্দর হল। রামকৃষ্ণ মিশনের পিছনে। পাঁচকুই রোড

৭। জাববান ধর্মশালা। তেলিওয়ারা

৮। কালীবাড়ি। মন্দির মার্গ। টেলি ৪৫২৭৪

৯। লাচ্চুমল জৈন ধর্মশালা ৪১১ এসপ্লানেড রোড

১০। লাডলি প্রসাদ ধর্মশালা ১—৩ বাগ দেওয়ার। ফতেপুরি

১১। লেডি হারডিনজ সরাই। নয়া দিললি রেলস্টেশনের বিপরীত

১২। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ধর্মশালা, মন্দির মার্গ, টেলি ৪৮২৮৫

১৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ধর্মশালা। ৭৭—৮৯ ফতেপুরি

* পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকার জন্যে ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস, ৮৮ জনপথ, টেলি ৪৩০০৫৮ এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সারনাথের স্তূপের ছায়ায়

কাশ্মীর থেকে কাশী। আর কাশী থেকে সারনাথ। মাইল ৫।৬ হবে। বাস ছিলো। কিন্তু—হাতের কাছে ছিলো না। কাশী প্রবাসী এক বাঙালী ভদ্রলোক বললেন, দরকার কী? আমি সাইকেল রিকসা ঠিক করে দেবো। টাকা ১২ নেবে। যাবে-নিয়ে আসবে। চেনা রিকসা আছে বহুৎ।

তাই ঠিক হলো। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুর নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম রামপুরা থেকে। সাইকেল রিকসা চেপে, দুধারের দৃশ্য ঢোকাতে-ঢোকাতে ঢিমেতালে এগুচ্ছি। মাথার উপর সূর্যের তেজ তেমন নয়। শীত বলেই 'নয়'। হাতের কাছ থেকে গুটিকয় গরম জামা তুলে বাস্কেট ভর্তি। ফিরতে সন্ধে হবেই। সঙ্গে বাচ্চারা আছে। সুতরাং, দরকার ছিলোই। আমি একটা হাফ-হাতা সোয়েটার আর মীনাক্ষী একটা চাদর। ব্যস, রওনা হলাম সারনাথের দিকে।

পীচপথ। কোথাও সাইকেল একাগাড়ি ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। কোথাও কিছু নেই। দুপাশে পড়োবাড়ি, বাগবাগিচা মসজিদ মুসলমান মহল্লার ভেতর দিয়ে চলছি তো চলছি। এখানকার রিকশাগুলো একটু ছোটখাটই। পিছন ভরে না। বেশ চাপা-ঠাসা লাগছিলো। এইভাবে কিছুক্ষণ গেলে সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে যাবে। ভুলই হলো—বাসে চমৎকার আসা যেতো। সুন্দর ঝকঝকে বাস, আমাদের রিকসা পার হয়ে গেল, মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। কী আর করা? রিকসা-রিকসাই সই। একসময় দেখি পথ বেঁকে গেছে সারনাথের দিকে। দুপাশে বিশাল বিশাল রেনট্রি। আলো আর ছায়ার মধ্যে মিঠে ঘণ্টা বাজিয়ে আমরা এগুচ্ছি।

চারটি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ সারনাথ। প্রাচীন নাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রচলিত মত। তবে ঋষিপতন ও মৃগদাব

নামটি তথ্যস্বীকৃত। কারো কারো মতে 'সারঙ্গনাথ' থেকে সারনাথ। বুদ্ধদেব এখানেই তাঁর 'ধর্মচক্র' প্রবর্তন বা সদাধর্মচক্র বিহার বা প্রবর্তন বিহার সম্বন্ধে তার বাণী প্রচার করেন। সারঙ্গনাথের মানে মৃগাধিপতি বা মৃগদেব। মহাদেবের একটি মন্দির আছে এখানে। ভগবান বুদ্ধ সারনাথেই প্রথম বোধিলাভের পর তার 'ধর্ম' প্রচার করেন। এখানেই প্রথম তাঁর পাঁচজন শিষ্যকে দীক্ষা দেন এবং বিহার বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।

খৃঃ পূঃ ৫২৮ শতাব্দীতে ভগবান তথাগত বুদ্ধ জগৎসমক্ষে তাঁর অমর বাণী অর্থাৎ মানবকল্যাণের সঞ্জীবনীমন্ত্র প্রচার করেন। দীক্ষান্তে ৬০ জন ভিক্ষু বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে প্রেরিত হন। বুদ্ধদেব প্রথমে ৫ জন শিষ্যসহ সারনাথে আসেন, তখন এখানে সবুজ জঙ্গলময় উদ্যান ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তিনি এখানে বিহার চৈত্য মন্দির গন্ধ কুটি ও ধর্মচক্রজীব বিহার তৈরি করান।

বুদ্ধের মহানির্বাণের প্রায় ২৫০ বছর পরে মৌর্যসম্রাট অশোক এখানে আসেন এবং স্তূপ বিহার ও চৈত্যাদির নির্মাণ করান। তাঁর তৈরি ১০০ ফুট উঁচু ধর্মরাজিকা স্তূপটি এখনো আছে। বুদ্ধদেব যখন সারনাথে আসেন, তখন তিনি দুটি বিহার তৈরি করান বলে শোনা যায়। কিন্তু, ঐ বিহার দুটি কোথায় ছিলো, তা আজো জানা যায়নি। অশোক, সারাভারতে ৮৪ হাজার স্তূপ ও বিহার তৈরি করিয়েছিলেন, ওদের প্রত্যেকটিতে বৌদ্ধ অনুশাসন লিপিবদ্ধ।

১৭৯৪ খৃঃ-এ কাশীর জগৎসিং নামে জনৈক বণিক 'ধর্মরাজিকা' স্তূপটি ভেঙে যাবতীয় পাথর নিয়ে গিয়ে নিজের নামে একটি মহল্লা তৈরি করান।

খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দী সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকরা বিশেষ আলোকপাত করতে পারেন নি। কিন্তু খনন কাজ শুরু হবার পর তাঁরা স্থিরনিশ্চয়, যে ঐ স্তূপ খৃঃ পূঃ ১ম বা ২য় শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিলো। বিখ্যাত সাঁচী স্তূপ ঐ সময়কার।

গুপ্তযুগকে, এককথায়, বৌদ্ধচক্রের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সারনাথে এসেছিলেন মৌর্যসম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে। তিনি ৪টি স্তূপ ও গুমফা আবিষ্কার করেন। পরবর্তীসময়ে নৃতত্ত্ববিদ ক্যানিংহ্যাম বিশদ ও বিস্তৃতভাবে সারনাথ আবিষ্কার করেন। খোঁড়ার ফলে জানা যায়, সারনাথের সমৃদ্ধ নগরী হুণ আক্রমণে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। এখানে গুপ্তযুগের দুটি শিলালিপিতে জানা গেছে, ২য় কুমারগুপ্ত এবং বোধগুপ্তের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪৭৩ এবং ৪৭৬-এ হুণ-আক্রমণে সারনাথ তুমুলভাবে নষ্ট হয়েছে। হর্ষবর্ধনের সময়ে সারনাথ পুনরুজ্জীবিত হয়।

মোগলযুগের বেশ কিছু ঝড়ঝাপটা সারনাথকে সহ্য করতে হয়েছে।

কাশীরাজ চৈৎ সিং-এর দেওয়ান জগৎসিং ধর্মরাজিকা ভেঙে তার মালমশলায় যখন জগৎগনজ সাজাচ্ছেন, তখনই প্রচুর পরিমাণ রত্নমনি, সোনারূপো পূতাস্থি এবং বুদ্ধমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সালে স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহ্যাম পূর্বসূত্র ধরে বিখ্যাত 'ধমকস্তূপ' এবং তার মধ্যে পাথর-পেটিকা সহ বহু মূল্যবান জিনিস অবিষ্কার করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এখন ঐ সব মূল্যবান সংরক্ষণ ভারতীয় যাদুঘরে। ১৮৫১-৫২ খৃঃ মেয়র কিট্টো অনেকগুলি স্তম্ভ আবিষ্কার করেন।

সারনাথে ধ্বংসস্তূপাকারে চৌখণ্ডীস্তূপ এখনো বর্তমান। বহু-লোকের ধারণা, এটিই সন্মুখচৈত্য। এখানেই পঞ্চভিক্ষুর সঙ্গে তথাগত প্রথমে আসেন।

খননের ফলে যখন যা পাওয়া গেছে সবই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। বৌদ্ধ পুরাকীর্তির এমন সংগ্রহ বুঝি ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই।

'মূল গন্ধকুটি'—ধর্মরাজিকা স্তূপের কাছেই, উত্তরদিকে। প্রবেশ পথ পূর্বমুখী। চারকক্ষ বিশিষ্ট। হিউ এন সাং-এর ভাষায় এর উচ্চতা দুশো ফুট।

অশোকস্তম্ভ—প্রধান মন্দিরের পশ্চিমদিকে ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়। মূল স্তম্ভটি নাকি ৫০ ফুট ছিলো। ধ্বংসাবশেষ চতুর্দিকে ছড়ানো। আমাদের অতিপরিচিত 'সিংহশীর্ষ অশোকস্তম্ভের' চূরটি এখানেই পাওয়া যায়। কথিত, মোগল আমলে স্তম্ভ চূড়ায় ক্ষতিসাধন করা হয়। এছাড়া, ধর্মচক্র, জিন বিহার, ধামেকস্তূপ, বোধিবৃক্ষ, চীনা বৌদ্ধ মন্দির, শিবমন্দির এবং তিব্বতীয় মন্দির অবশ্য দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালে সারনাথের নাম ঋষিপতন ও মৃগদাব ছিলো। নিঃসঙ্কোচ চারণভূমিতে ছিলো অসংখ্য মৃগ। বুদ্ধের সময়েও ছিলো। তাঁর ২৫০০ তম মহাপরিনির্বাণে ভারত সরকার ১০ একর পরিমিত স্থানে একটি মৃগদাব প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ১০০টি হরিণ এখানে নিঃসঙ্কোচে ঘোরাফেরা করছে। চারিদিকে রঙ বাহার। রঙের মাথামাথি। হ্রদে নীল জল আর লাল সাদা পদ্ম।

সন্ধে হয়ে আসছে। আমরা ফেরার জন্য তাড়া করতে লাগলাম। মনে হলো এই অতিপ্রাচীন পবিত্র সারনাথের প্রতিটি ইট পাথর ভাঙা ভাঙা ভাষায় কী কথা বলার চেষ্টা করছে। দূর থেকে, হয়তো বা তিব্বতীয় মন্দির থেকেই ভেসে আসছে ঐ ভাঙা ভাষার রাঙা ধ্বনি-মাধুর্য—ওম মণিপদমে হুঁ।

আগ্রা হোটেল-তালিকা

	হোটেল		সিঙ্গল	ডবল			
১ ।	হোটেল মুঘল । তাজ গনজ । টেলি ৬৪৭০১	এসি	১৬৫-২১০	২২৫-২৭০			
২ ।	হোটেল ক্লারকস সিরাজ । ৫ তাজরোড । টেলি ৮৩৪২১	এসি	১৫০.০০	২৩৫০.০০			
৩ ।	হলিডে ইন । তাজগনজ । টেলি ৬৪১৭১ (১০ লা)		১২৫.০০	১৮৫.০০			
৪ ।	হোটেল মুমতাজ । ১৬১।২ ফঁতেহাবাদ রোড । টেলি ৭৫৫৮০		৮০.০০	১৩০.০০	১২০.০০	২৩০.০০	
৫ ।	লরিজ হোটেল । মহাত্মা গান্ধী রোড । টেলি ৭৪০২৫		৭৫ ০০	,২০.০০			১০%
		এসি নয়	৬৫.০০	১১০.০০			
৬ ।	গ্রানড হোটেল । ১৩৭ স্টেশন রোড । টেলি ৭৬৩১১		৬০.০০	৭৫ ০০			
	৭৪০১৪		৩৫.০০	৫০.০০			৬১/২%
			[ব্রেকফাস্ট সহ]				
৭ ।	জাইওয়াই হোটেল । ৩ তাজ রোড । টেলি ৬৪১৪১		৫০.০০	৭০.০০	৮০.০০	১০০.০০	
	,, ৬৪১৪২		[ব্রেক ফাস্ট সহ]				১০%
৮ ।	ময়ূর ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স		৮০.০০	১১০.০০	১২৫.০০	২০০.০০	
	ফতেহাবাদ রোড । টেলি ৬৪৮৪১		৬৫.০০	৮০.০০	১১০.০০	১৭০.০০	
৯ ।	খান্না হোটেল । আজমেড় রোড । টেলি ৭৫৯৮৩		৪০.০০	৫৫ ০০			
		এসি নয়	[ব্রেক ফাস্ট সহ]				১০%

১০। ইম্পীরিয়াল হোটেল	এসি নয়	৩৫.০০	৫৮.০০		১০%
১১। আগ্রা হোটেল। জেনারেল কারিয়াপ্পা রোড আগ্রা, ক্যাণ্ট। টেলি ৭২৩৩০		২৫-৩০	৩০.৫০	৫৫.০০	৭৫.১০০
১২। ইনডিয়া হোটেল পেরতাবপুরা। টেলি ৭২৩২৬	,,	২৫-৩০	৩৫-৬০		
১৩। হোটেল ট্যুরিস্ট পি ডবলু ইনসপেকশন হাউসের কাছে স্টেশন রোড। টেলি ৭৫৭৪৭	,,	২৫	৩০		
১৪। এমপ্রেস হোটেল। এম জি রোড। টেলি ৭৫৫৪৮	,,	১৫-২০	২০-৩৫	৩৫-৪০	৬৫-৭৪
১৫। জাগগি হোটেল সদরবাজার। টেলি ৭২৩৭০	,,	১৫	২৫	২০-২৫	৩৮-৪৫
১৬। গোবর্দ্ধন হোটেল। দিললি গেট। টেলি ৭৩৩১৩	,,	.৪	২৫		
১৭। বেঙ্গল লজ। রাকাবগনজ রোড টেলি ৭২৪০০	,,	১৩-২০	২০-৪০	২৫-৩৫	৫০-৭০
১৮। আগ্রা কেটারার্স। দি মল, আগ্রা ক্যানট। টেলি ৭২২৭১	,,	১২-৩০	১৫-৩০		
১৯। অশোকা হোটেল। দিললি গেট। টেলি ৭৫২০৮	,,	১০	১৫-২৫	২০-২৫	৪০-৫০

কনডাকটেড ট্যুর

ফতেপুর সিক্রি আগ্রা কোরট তাজমহল	দৈনিক ১০.৩০—বিকেল ৪.৩০ পর্যন্ত আগ্রা ক্যান্ট রেলস্টেশন থেকে যাত্রা শুরু ও শেষ। ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস থেকে যাত্রী তোলা হয় ১৯১ দি বেলা ঠিক ১০.০০ টায়	সাধারণ ১৩ টাঃ ০৫ পঃ ডিল্যাক্স ১৮ টাঃ ৬০ পঃ ডিল্যাক্স লানচ, চা আর ঠাণ্ডা পানীয় সহ ৩০. টাঃ ৩৫ পঃ এসি লানচ চা সহ ৩৬ টাঃ ১০ পঃ

মথুরা

১।	আগ্রা হোটেল। বাঙালী ঘাট। টেলি ২১৩	এসি নয়	৬-১৭	১৬-২০	৩০	৫২-৫৮
২।	কোয়ালিট হোটেল। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে। টেলি ২৭২	,,	১০	১৫	১৫	২৫
৩।	ব্রিজবিহার হোটেল। তিলকদোয়ার রোড। টেলি ১০১৮	,,	৬ ৮	১৫-২০		
৪।	মডারন হোটেল। ছাত্তা বাজার। টেলি ৫১১		৫	৮		
৫।	প্রেম হোটেল। তিলকদোয়ার		২-৩	৪-৮		

অন্যান্য থাকার জায়গা

থাকার জায়গা	রিজার্ভেশন
১। পি ডবলু ডি ইনসপেকশন বাংলো। কালেকটরেটের কাছে। টেলি ৪৬৬ ২০.00 স্যুইট পিছু	রিজার্ভেশন : একজি. ইনজিনিয়ার, প্রভিননিয়াল ডিভিশন, পি ডবল ডি, মথুরা। টেলি ৩৩৪ রাঁধুনি আছে। বিছানা আছে।
২। ফরেস্ট রেস্ট হাউস প্যারাডাইস এলে, আগ্রা রোড, ক্যানটনমেড টেলি ৪৯১ সিঙ্গল ২.00 ৩৭৫	রিজার্ভেশন : ডি এফ ও, ব্রিজভূমি ডিভিশন ২৩ বিজয়নগর কলোনি, আগ্রা। টেলি ৭৩০২৩
সফররত সরকারি অফিসারদের জন্যে	
৩। শেখরী কিষান নিবাস ডাম্পিয়ার নগর ডবল ৩.00 স্যুইট ১২.00	রিজার্ভেশনঃ চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারি, জেলা কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ডাম্পিয়ার পার্ক, মথুরা। টেলি ১৭১, ৩৬৮
৪। শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী ডালমিয়া ইনটারন্যাশনাল গেস্টহাউস, কেশবদত্ত কাটরা, জন্মভূমি। টেলি ৮৫৭ ডবল ৬/১০.00 (স্নান ঘর সংলগ্ন), ৪.00 (সাধারণ)	রিজার্ভেশন : ম্যানেজার, শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা মঙ্গল, মথুরা
৫। রেলওয়ে রিটায়ারিং (রেলযাত্রীদের জন্যে) জংশন রেলওয়ে স্টেশন।	রিজার্ভেশন : স্টেশন মাস্টার : সিঙ্গল ৮.00 অতিরিক্ত শয্যা ৪.00, শিশু ২.00

অন্যান্য থাকার জায়গা সিঙ্গল ডবল

১। ইউ পি এস টি ডি সি ১৫·০০ ২০·০০ স্যুইট (৪ শয্যা)
ট্যুরিস্ট বাংলো রাজা-কি-মানডি ৩০·০০ ডরমিটরি
রেলস্টেশন টেলি ৭২১২৭ শয্যাপিছু ৫·০০

১০ বছরের কম শিশুর চার্জ নেই।

রিজার্ভেশন : ট্যুরিস্ট অফিসার, ইউ পি এস টি ডি সি ট্যুরিস্ট বাংলো টেলি ৭২১২৩।

৭ দিন আগে পুরো টাকা পাঠিয়ে রিজার্ভেশন করা যাবে।

২। আর্কিওলজিক্যাল সারভে রেস্ট হাউস

(ক) সিকান্দ্রা : ডবল ৮·৫০। বিজলী আলাদা

(খ) ফতেপুর সিক্রি : ডবল ৮·৫০। বিজলী আলাদা। রাঁধুনি আছে। রিজার্ভেশন : সুপারিনটেনডিং আরকিওলজিস্ট, আরকিওলজিক্যাল সারভে অব ইনডিয়া, নরদারন সারকল, ২২ দি মল, আগ্রা ক্যাটনমমেন্ট। টেলি ৭৪০১৭

৩। পি ডবলু ডি ইনসপেকশন বাংলো, মহাত্মা গান্ধী রোড, আগ্রা ক্যাণ্ট ৩০·০০ স্যুইট (বিদেশীদের জন্যে) ১০·০০ স্যুইট (ভারতীয়দের জন্যে)

রিজারভেশন : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার। প্রভিনসিয়াল ডিভিশন, পি ডবলু ডি (বিলডিংস/রোডস) কারিয়াপ্পা রোড। টেলি ৭৪০১৬

৪। রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমস

[শুধু রেলযাত্রীদের জন্যে]

৫। আগ্রা ক্যানটনমেণ্ট রেলওয়ে স্টেশন। টেলি ৭২১২১

এসি সিঙ্গল ২০·০০। ডবল ৩০·০০। আলাদা শিশুশয্যা ৫·০০

এসি নয় „ ১২·০০। „ ৩০·০০। „ „ ৩·০০

৬·০০ ডরমিটরিতে শয্যাপিছু রিজার্ভেশন : স্টেশনমাস্টার

৬। আগ্রা ফোর্ট রেলস্টেশন। টেলি ৭৬১৬১

এসি নয় ডবল ১২'০০। ৪-শয্যাবিশিষ্ট ঘরে মাথাপিছু ৭'০০। ডরমিটরি ৩'৫০ রিজার্ভেশন : স্টেশনমাস্টার

৭। পেয়িংগেস্ট থাকার জন্যে : (ক) মেজর বক্সি সরদার সিং (অবসরপ্রাপ্ত) ৩৩/৮৩ আজমেড় রোড, আগ্রা ক্যান্ট। টেলি : ৭৬৮২৮।

সিঙ্গল ১২'০০ ডবল ২০-২৫ অতিরিক্ত শয্যাপিছু ৮'০০

(খ) মিসেস নেভাল এম. ফ্রামজী। ১৬ গোপীচাঁদ শিবহরে রোড (ম্যানসফীলড রোড), আগ্রা ক্যান্ট। টেলি ৭২২০৫

শুধু ঘরভাড়া। সিঙ্গল ১২'৫০ ডবল ২০'০০। লানচ ডিনার মাথাপিছু ১০'০০। ব্রেকফাস্ট ৭'০০

ধর্মশালা

আগরওয়াল পঞ্চায়েতি, ফকিরচাঁদ গেস্ট হাউস, গয়াপ্রসাদ বিহারীলাল, জানকীপ্রসাদ ধরমশালা, প্রতাপচাঁদ ধরমশালা (রাজা-কি-মানডি এবং আগ্রা সিটি রেলস্টেশনের কাছে খোঁজ করতে হবে)।

● খাবার দেওয়া হয় না। বেডিং-এর জন্যে ন্যূনতম ভাড়া লাগে।

ধর্মশালা

(১) আমেদাবাদওয়ালি ধরমশালা। ছাত্তা বাজার
(২) ভিওয়ানিওয়ালি ধরমশালা। বাঙালীঘাট
(৩) কলকত্তাওয়ালি ধরমশালা। আর্যসমাজ রোড
(৪) গঙ্গা ধরমশালা। রামদাস মন্দির
(৫) হাথরাসওয়ালি ধরমশালা। স্বামীঘাট
(৬) জৈন ধরমশালা। বৃন্দাবন দরওয়াজা
(৭) কাশী দাঈ ধরমশালা। বাঙালীঘাট।
(৮) লাড়হা কুঞ্জ ধরমশালা। রামঘাট

বৃন্দাবন

রেস্তোরাঁ।

(১) অলকা হোটেল এ্যানড রেস্টুরেন্ট। তিলক গেট
(২) ভাটিয়া রেস্টুরেন্ট। ভারতপুর গেট
(৩) শংকর রেস্টুরেন্ট। তিলক গেট
(৪) উত্তম রেস্টুরেন্ট। জওহর গেট

ট্যুরিস্ট অফিস

ইউ পি গভঃ টুরিস্ট ব্যুরো। বাস স্ট্যানড / মথুরা

সড়ক-পথে			
	আগ্রা	৫৪ কিমি	৩৪ মাইল
	আলোয়ার	১১৩ ,,	৭০ ,,
	ভরতপুর	৩৬ ,,	২২ ,,
	দিললি	১৪১ ,,	৮৮ ,,

সারনাথ

(১) ক্লারকস হোটেল। এসি সিঙ্গল ৭০˙০০ ডবল ১২০˙০০
(২) হোটেল দ্য প্যারী। এসি নয় ৫০˙০০ এসি ৬০˙০০
ডবল ৮৫˙০০ এসি ৯৫˙০০
(৩) ইউ পি গভঃ ট্যুরিস্ট বাংলো। প্যারেড কোঠি। বারানসী

সিঙ্গল রুম	৬	দিনে	৫˙০০
ডবল রুম	৩	,,	৮˙০০
৩-শয্যা	২	,,	১০˙০
ডিলুক্স সিঙ্গল	২	,,	১০˙০০
,, ডবল	১১	,,	১৬˙০০
ডরমিটরি ১০ বেড্	১	,,	২˙০০

রিজার্ভেশন : রিজিওলাল ট্যুরিস্ট অফিসার। বারানসী
টেলি ৬৩১৮৬

পর্যটন-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংবাদ

তাজমহলের পরিপ্রেক্ষিতের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তোলার জন্যে যমুনার দুইতীর ধরে একটি জাতীয় উদ্যান (ন্যাশনাল পার্ক) রচনায় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাজ শুরুও হয়ে গেছে।

* *

উত্তর প্রদেশ ট্যুরিজম দফতর ঝাঁসি-খাজুরাহো ট্যুর শুরু করেছেন সপ্তাহে একবার করে। রবিবার ঝাঁসি রেলস্টেশন থেকে ৭'৩০ সকালে ছেড়ে দুপুর ১'৩০ মিনিটে খাজুরাহো পৌঁছুচ্ছে। ভাড়া আসা-যাওয়া ৫০'০০ মাথাপিছু দুপুরের খাবার আছে, চা আছে, দর্শনীও অন্তর্ভুক্ত। বিশদ বিবরণের জন্যেঃ রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরো, ঝাঁসী। ফোন ১২৬৭-এ যোগাযোগ করতে হবে।

* *

খাটাউলিতে নতুন ওয়ে-সাইড রেস্টুরেন্ট 'চীতল' খোলা হয়েছে। দিললি-হরিদ্বার-দেরাদুন-মুসৌরি সড়কে পর্যটকদের সুবিধার জন্যে প্যাকড লানচের ব্যবস্থা আছে।

* *

লখনৌ ট্যুরিস্ট বাংলোয় বর্তমানে ৫৪-টি শয্যা। আরো বাড়াবার জন্যে ২৬ লক্ষ টাকায় এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাজ পুরোদমে চলছে।

* *

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম পর্যটকদের সুবিধার জন্যে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেছে।

(১) হৃষীকেশ—কাঠমানডু। ভাড়া মাথাপিছু ৪৫০'০০

(২) হৃষীকেশ—করবেট ন্যাশনাল পার্ক। ৫ দিনের সফর। মাথাপিছু ২০০'০০।

(৩) হৃষীকেশ—দেবপ্রয়াগ। একদিন। ২০'০০ মাথাপিছু

(৪) হৃষীকেশ—কুঞ্জপুরী। একদিন। ১০'০০ মাথাপিছু
(৫) দেরাছুন—ডাকপাথর। একদিন। ৮'০০ মাথাপিছু

* *

নবাবগনজ পক্ষিনিবাস : লখনৌ-কানপুর রাস্তায় ৪০ কিমি দূরে নবাবগনজ। সেখানে পক্ষিনিবাসের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। ট্যুরিস্ট বাংলো এবং ক্যাফেটেরিয়া তৈরি শেষ। সাইবেরিয়া থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার পেলিক্যান, হর্ণবিল, টিল প্রভৃতি আসে। গোটা শীতকাল থাকে।

* *

আগ্রার রিজিওনাল ট্যুরিস্টব্যুরো রাজা-কি-মানডি থেকে ২৭ তাজ রোডে গেছে। ফোন ৭৫৮৫২।

* *

এলাহাবাদ-দর্শন : ইউ পি রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোঃ নিয়মিত এলাহাবাদ শহর পরিক্রমা শুরু করেছেন। এঁরা দেখাচ্ছেন ত্রিবেনী, ছুর্গ, আনন্দভবন প্রভৃতি। প্রতিশুক্রবার ভোর ছটায় ট্যুরিস্ট বাংলো—৩৫ মহাত্মা গান্ধী মার্গ, থেকে ছাড়ে। সকাল ১০টার মধ্যে ফিরে আসে। ভাড়া মাথাপিছু ১০'০০। গঙ্গাযমুনা সরস্বতীর সঙ্গমতীরবর্তী এই শহরের আরেকনাম প্রয়াগরাজ বা তীর্থরাজ। পুরানকথা, রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

* লখনৌ-খাজুরাহো বাস সার্ভিস শুরু : গত বছরের এপরিল থেকে লখনৌ খাজুরাহো নিয়মিত বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে থেকে ছাড়ছে ভোর ৫ টায়। খাজুরাহো পৌঁচুচ্ছে ছুপুর সাড়ে বারো। আবার বিকেল চারটেয় ছেড়ে রাত সাড়ে এগারোটায় লখনৌ। একপিঠের মাথাপিছু ভাড়া ২৩'৩০ পয়সা।

* *

গঙ্গা-কাবেরি একসপ্রেস ট্রেন উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সহজ যোগাযোগ স্থাপন করলো। বারানসী-মাদরাজ ভায়া এলাহাবাদ

আসছে এই ট্রেন। ১৩৯ আপ বারানসী ছাড়ছে কি রোববার সকাল ৬টায়, এলাহাবাদ পৌঁছুছে ১০-২০ এ। বিশ মিনিট স্টপের পর মাদরাজ অভিমুখে। একই ভাবে পরদিন ফিরছে বারানসীতে।

* *

সত্যনারায়ণ: দিললি বদরিনাথ রাস্তায় হরিদ্বার থেকে মাত্র ১৩ কিমি। পর্যটকরা তেমন জানেন না। হিন্দুতীর্থ। একটি মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর সত্যনারায়ণ মূর্তি। কেদার বদরি যেতে দশ বছর আগে তীর্থযাত্রীরা এখানে বিশ্রাম নিতে আসতেন। এখন পিকনিক করা ছাড়াও এটি মাছ মারিয়েদের স্বর্গ হিসাবে বিখ্যাত হয়েছে। ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে। হরিদ্বার থেকে তাতে থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

* *

হরিয়ানা ট্যুরিজমের সঙ্গে সহযোগিতায় ইউ পি ট্যুরিজম বুলন্দ সহরের নারোরায় ট্যুরিস্ট সেনটার করেছে। যমুনাতীরে এ-জায়গার তুলনা মেলা ভার। রেস্টুরেণ্ট 'গ্যাজেল' ইতিমধ্যেই খুলেছে। ট্যুরিস্ট বাংলো তৈরি হচ্ছে।

* *

বৃন্দাবনে আন্তর্জাতিক অতিথিশালা: ইনটার ন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেশ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম ইনটার ন্যাশনাল গেসট হাউস তৈরী করছে। ৪৪টি ঘর। পশ্চিমী কেতার চূড়ান্ত। কিছু ঘর শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত। রেস্টুরেণ্ট সংলগ্ন। নিরামিশ, ভারতীয় এবং পশ্চিমীখানা, সবই পাওয়া যায়। সিঙ্গল ১৫·০০ দিনে। ডবল ২৫·০০।

* *

হোটেল মেঘদূত ডিসকাউনট দিচ্ছে: রাণীক্ষেতের হোটেল ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্যে অফ-সীজন রিবেট দেবার কথা ঘোষণা করেছে ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ এপরিল—শতকরা ৩০ ভাগ ছাড় এবং জুলাই ১৫ থেকে আগস্ট ৩১ পর্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগ ছাড়।

ট্রাভেলরস লজ, রেস্ট হাউস এবং হোটেল ছাড়াও তীর্থ পথে সুবিধার জন্যে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম অনেক নতুন ব্যবস্থা করেছেন। যেমন—

তাঁবু (১) পিপালকোটি } দুটো জায়গাতেই ২৮ জন করে
(২) লঙ্কা } থাকার ব্যবস্থা
(৩) হনুমান চটি } ১৫ জন করে
(৪) ভোজবাসা }
(৫) ৫ টা করে ডবলবেড এ্যালউইন কটেজ
(ক) রুদ্রপ্রয়াগ
(খ) বদরীনাথ
(গ) লঙ্কা
(ঘ) হনুমানচটি

চারজ (১) তাঁবুতে—৬.০০ মাথাপিছু দিনে
(২) এ্যালউইন কটেজে—২০.০০ মাথাপিছু দিনে

রিজার্ভেশন ও অন্যান্য বিবরণের জন্যে : অপারেশনাল ম্যানেজার।
যাত্রা অফিস, গাড়োয়াল
মণ্ডল বিকাশ নিগম
লিমিটেড, মুনি-কি-রেতি
(হৃষীকেশ)

ট্যুরিস্ট বাংলোর চারজ ১ মে ১৯৭৭ থেকে বেড়েছে

উত্তর প্রদেশ রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন কর্পো : এলাহাবাদ, আগ্রা, লখনৌ, বারানসী, সারনাথ, অযোধ্যা এবং হরিদ্বারের লজগুলির ভাড়া কয়েক টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এসি নয় ডবলবেড	২৫'০০
ডবলবেড (একজন নিলে)	২০'০০
তিনবেডের ঘর	৩৫'০০
(দুজনের জন্যে)	২৫'০০
(একজন নিলে)	২০'০০
এসি ডবল	৪০'০০
(লখনৌ আর এলাহাবাদে আছে)	
ডরমিটরি শয্যাপিছু	৫'০০

লখনৌ-এ নতুন হোটেল ঃ সারা বছরের পর্যটকচাপ সামাল দেবার জন্যে লখনৌ-এর হজরত গনজে 'চৌধুরী লজ' নামে এক নতুন হোটেল হয়েছে। সিঙ্গল ১৫'০০—২০'০০ ডবল ২৫'০০—৩০'০০

শীততাপনিয়ন্ত্রণের জন্যে অতিরিক্ত ১০'০০

———